ও

গুরুতত্ত্ব

শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আম্নায়ধারা ও গুরুতত্ত্ব

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী

প্রকাশক ঃ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাশ্রম (রেজিঃ)
শ্রীধাম গোদ্রুম
পো ঃ- স্বরূপগঞ্জ, নবদ্বীপ
নদীয়া
পিন - ৭৪১৩১৫

প্রকাশকাল ঃ-
শ্রীগৌরজয়ন্তী বাসর
৩০ গোবিন্দ, ৫২৪গৌরাব্দ
৪ঠা চৈত্র, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
১৯ শে মার্চ, ২০১১ খৃষ্টাব্দ

এই ভক্তিগ্রন্থ বিক্রয় হয় না।
শ্রদ্ধা মূল্যে বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

শ্রীভগবদ্ প্রেমসেবা প্রাপ্তির একমাত্র উপায় আম্নায়ধারা ও আচার্য্য। আম্নায়ধারা ও আচার্য্য পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আম্নায়ধারার আচার্য্য ব্যতীত ভগবদ্ প্রেমসেবা প্রাপ্তি অসম্ভব। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও এই আম্নায়ধারা ও আচার্য্যকে লঙ্ঘন করেন নি। এই আম্নায়ধারাকে লঙ্ঘন করে জীব কোনও কালে ভক্তি বা ভগবানকে লাভ করতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে জীব এই আম্নায়ধারা ও গুরুতত্ত্বের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ভগবদ্ প্রেমসেবা হতে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। আম্নায় ধারার আচার্যই একমাত্র ভগবদ্ আজ্ঞায় বিশুদ্ধভাবে বাস্তব সত্যের কথা কীর্ত্তন করে জীবকে ভগবদ্ সেবার পথে পরিচালিত করে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ পাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত করতে সমর্থ।

জীব যাতে প্রকৃত আম্নায়ধারায় আগত সদ্গুরুকে গুরুত্বে বরন করে নিত্য বাস্তব মঙ্গল লাভ করতে পারে তার জন্য আম্নায়ধারার বিশুদ্ধতাসংরক্ষণকারী আচার্য্য জগদ্গুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিভূষন ভারতী গোস্বামী ঠাকুর "আম্নায়ধারা ও গুরু তত্ত্ব" প্রনয়ন করে জীবের বাস্তব সত্যের পথকে আলোয় আলোকিত করেছেন। আম্নায়ধারার পূর্ববর্ত্তী আচার্য্যগন আম্নায়ধারা ও আচার্য্য সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব দান করে গেছেন তার থেকে চয়ন করে জগতে বিতরন করলেন, যাতে জীব ভ্রান্তপথে পরিচালিত না হয়ে বাস্তব সত্যের পথ অনুসরন করতে পারেন। এই গ্রন্থ অনুশীলনে প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু মাত্রেই বাস্তব সত্যের সন্ধান লাভ করে কৃত কৃতার্থ হবেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

এই গ্রন্থ মুদ্রণে মাদৃশ জীবের অযোগ্যতা হেতু মুদ্রন জনিত ভুল-ত্রুটি মার্জ্জনা করে সার গ্রহণে প্রার্থনা জানাই।

ইতি

শ্রীগুরুদেবের পদরেণুভিখারী

শ্রীব্রজদুলাল দাস

(শ্রীল ভক্তিভূষণ ভারতী গোস্বামী ঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত 'গুরুতত্ত্বের' কিয়দংশ)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

প্রথম সংস্করণ অর্থাভাবে মাত্র ২৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ভক্তবৃন্দের অত্যন্ত আগ্রহে ও অনুরোধে এই গ্রন্থ পুনরায় প্রকাশিত হল। প্রথম সংস্করণে কিছু মুদ্রাকর ও নিজের অযোগ্যতা নিবন্ধন প্রমাদ ছিল। এই সংস্করণে তা যথাসম্ভব সংশোধনের চেষ্টা করা হল। এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্য করেছেন - মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্নিগ্ধ শিষ্য শ্রীতমালশ্যাম দাসাধিকারী। ভক্তবৃন্দের অত্যন্ত আগ্রহে শ্রীগৌরসুন্দরের অযাচিত করুণায় তিনি এই গ্রন্থ সেবায় সাহায্য করলেন।

ইতি
বিনীত
শ্রীগুরুকৃপারেণু ভিখারী
শ্রীব্রজদুলাল দাস

শ্রীবলদেব প্রভুর শুভ আবির্ভাব
তিথি বাসর
২৯ শ্রীধর, ৫২৫ শ্রীগৌরাব্দ
২৭শে শ্রাবণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
১৩ই আগষ্ট, ২০১১ খৃষ্টাব্দ

Om Vishnupad Paramahansa
108 Sri Srila Sachchidananda Bhaktivinode Thakur
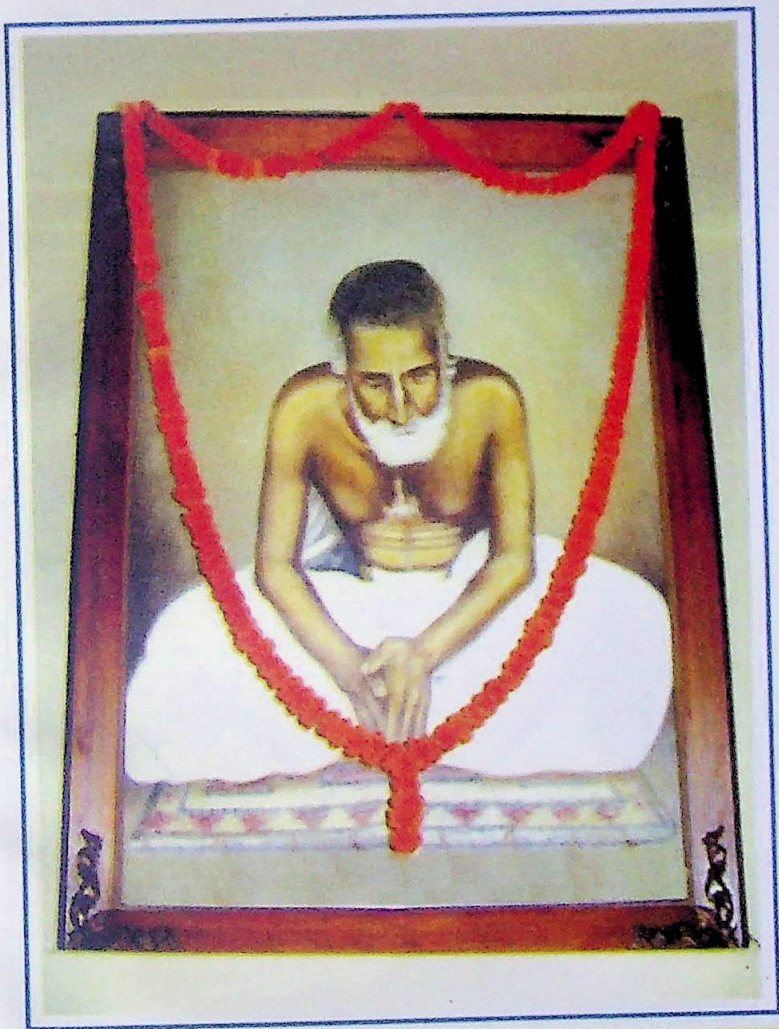
Om Vishnupad Paramahansa
108 Sri Srimad Gourkishore Das Babaji Maharaj
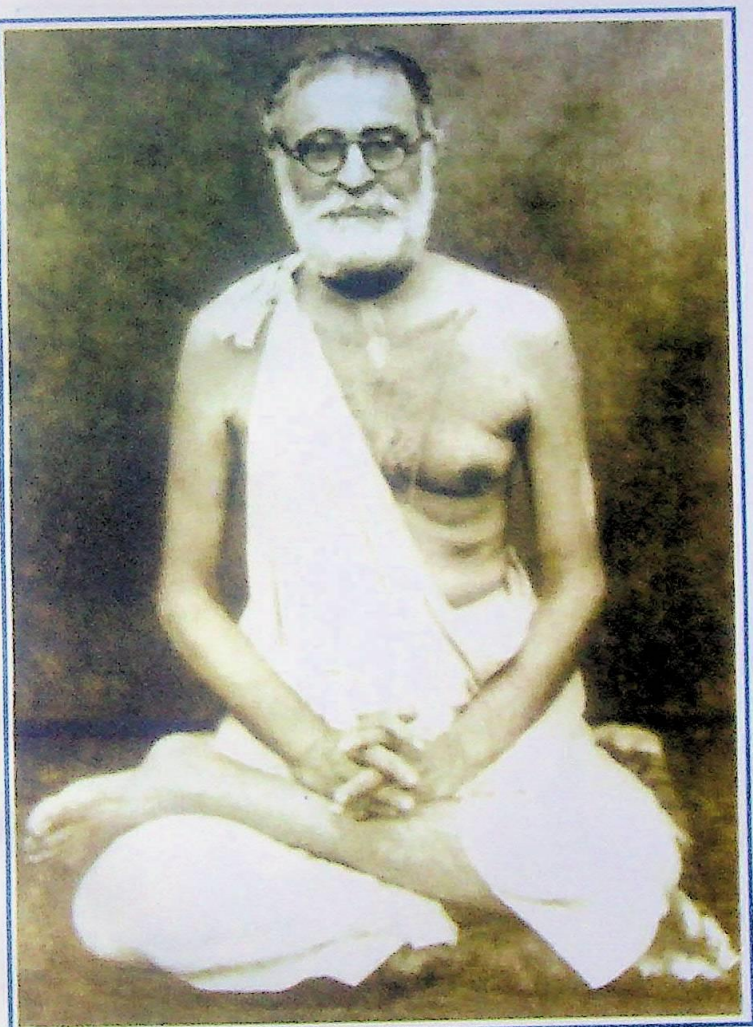
Om Vishnupad Paramahansa108 Sri
Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati GoswamiThakur
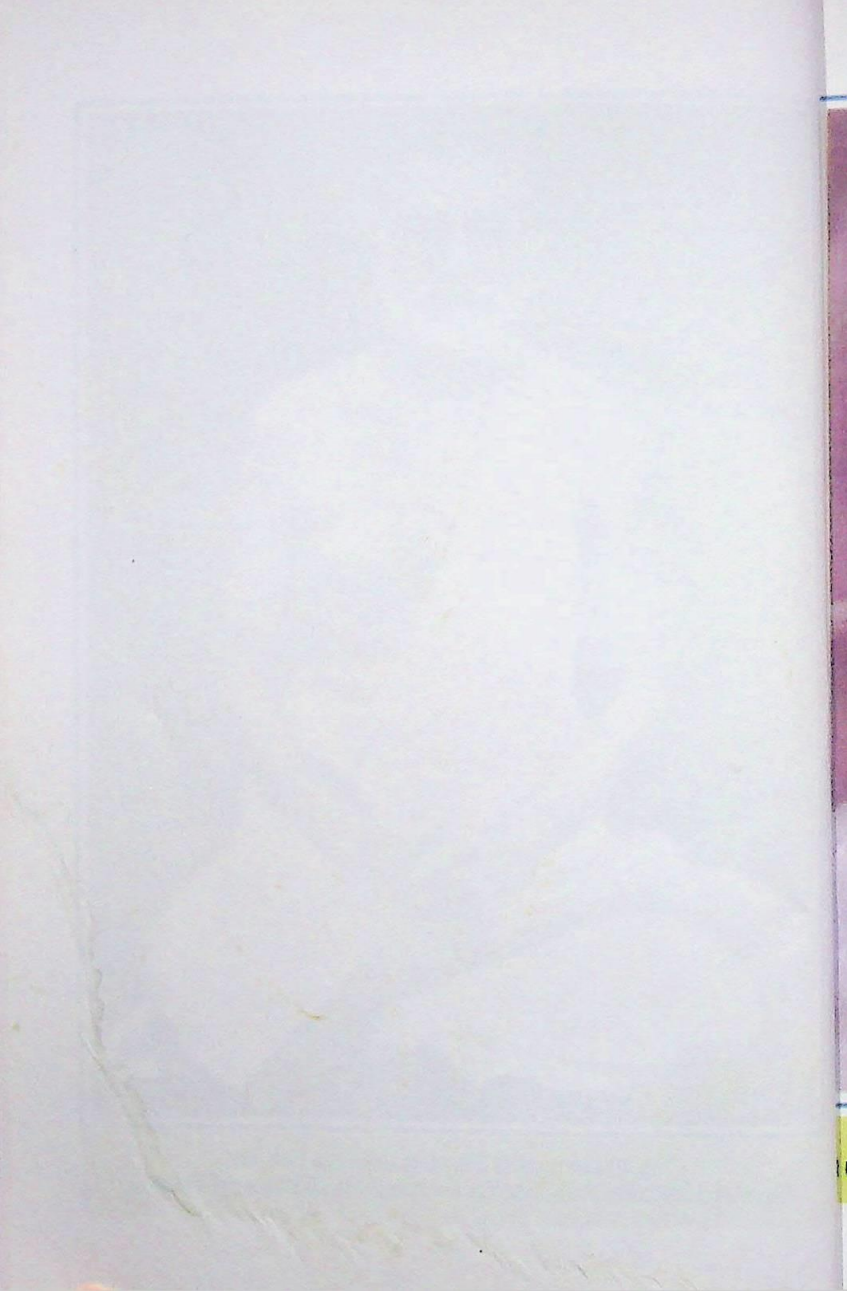
Om Vishnupad Paramahansa
08 Sri Srimad Bhakti Prasad Puri Goswami Thakur
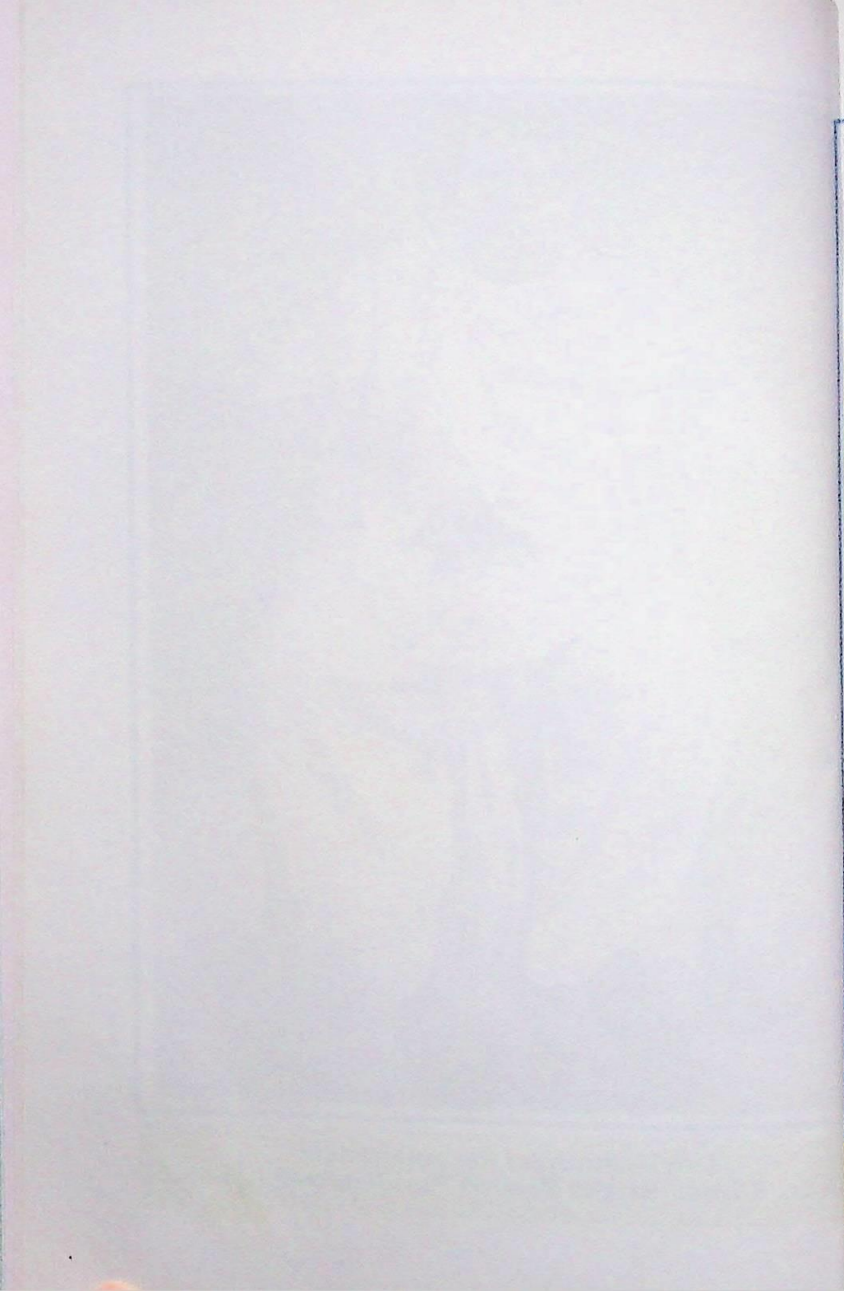
Om Vishnupad Paramahansa
108 Sri Srimad Bhakti Pradip Tirtha Goswami Thakur

Om Vishnupad Paramahansa 108 Sri
Srimad Bhakti Keval Audulomi Goswami Thakur

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আম্নায়ধারা ও গুরুতত্ত্ব

আম্নায়ধারা

শ্রীকৃষ্ণ- ব্রহ্ম-দেবর্ষি- বাদরায়ণ -সংজ্ঞকান।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্।।
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্।।
পুরুযোত্তম-ব্রহ্মণ্য ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ।।
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ।।
মহাপ্রভু-স্বরূপ-দামোদরঃ প্রিয়ঙ্করঃ।
রূপ-সনাতনৌ দ্বৌ চ গোস্বামিপ্রবরৌ প্রভু।।
শ্রীজীবো রঘুনাথশ্চ রূপপ্রিয়ো মহামতিঃ।
তৎপ্রিয়ঃ কবিরাজ-শ্রীকৃষ্ণদাসপ্রভুর্মতঃ।।
তস্য প্রিয়োত্তমঃ শ্রীলঃ সেবাপরো নরোত্তমঃ।
তদনুগতভক্তঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সদুত্তমঃ।।
তদাসক্তশ্চ গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্যভূষণম্।
বিদ্যাভূষণপাদ শ্রীবলদেবসদাশ্রয়ঃ।।
বৈষ্ণবসার্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথপ্রভুস্তথা।

শ্রীমায়াপুরধাম্নস্তু নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।।
শুদ্ধভক্তিপ্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ।
শ্রীভক্তিবিনোদো দেবস্তৎপ্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ।।
তদভিন্নসুহৃদ্‌বর্য্যো মহাভাগবতোত্তমঃ।
শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্ বৈরাগ্যং বিগ্রহাশ্রিতম্।।
মায়াবাদি- কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-নিরাসকঃ।
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তপদ্মবিকাশকঃঃ।।
দেবোহসৌ পরমো হংসো মত্তঃ শ্রীগৌরকীর্ত্তনে।
প্রচারাচারকার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ।।
হরিপ্রিয়জনৈর্গম্য ওঁ বিষ্ণুপাদপূর্ব্বকঃ।
শ্রীপাদো ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহোদয়ঃ।।
দশমাধস্তত্বেন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ।
আম্নায়পারম্পর্য্যেণ খ্যাতাঃ শ্রীগৌরকীর্ত্তনে।।
শ্রীভক্তিপ্রসাদপুরী- ভক্তিপ্রদীপতীর্থকৌ।
শ্রীমদ্ভক্তিকেবলাখ্য ঔড়ুলোমি - মহোদয়ঃ।।
গৌড়ীয়মণ্ডলাধ্যক্ষঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনলম্পটঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যাবিগ্রহো বিশ্বমঙ্গলঃ।।
সর্বে তে গৌরবংশ্যাশ্চ পরমহংসবিগ্রহাঃ।
বয়ঞ্চপ্রণতা দাসাস্তদুচ্ছিষ্টগ্রহাগ্রহাঃ।।”

--(০)--

বহিরঙ্গা, তটস্থা, অন্তরঙ্গা এই তিনটি ভগবানের শক্তি। বহিরঙ্গা মায়া শক্তি দ্বারা এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত। তটস্থা শক্তির পরিণাম এই জীব শক্তি এবং অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা বৈকুণ্ঠ, অযোধ্যা, দ্বারকা, বৃন্দাবনাদি ধাম প্রকটিত। ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত জীবসমূহকে মায়াশক্তি পরিচালিত করেন। এই প্রপঞ্চের যেদিকে তাকাই সবই অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর হলেও এই অনিত্য নিরানন্দ মায়াময় প্রহেলিকার রাজ্যে নিত্য পরমানন্দপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-ময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিজজনগণের নিত্য আবির্ভাব - এটি অত্যদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য লৌকিকের মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার। পরমকরুণাময় রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবকে এই দুঃখপূর্ণ, পুঁতিগন্ধময় স্বার্থযুক্ত প্রপঞ্চে পাঠিয়ে আবার তাদেরকে নিজচরণ সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর নিজজনকে পাঠান। তাঁরা এসে এ জগতে প্রথমেই জীবের স্বরূপভ্রম দূর করে নিত্য বাস্তব সত্যের তত্ত্ব দান করেন। এই রাজ্যটা মায়িক। চিরকাল এখানে থাকা যায় না, এখানে নিত্য শাশ্বত আনন্দ নেই -এটা অনুভব করান। শ্রীভগবান্ প্রেমময়, রসময়, আনন্দময়। সেইখানেই চির আনন্দের আবাসস্থল- এই কথা জীবের কাছে কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের নির্বাচিত ব্যক্তিই সদ্গুরুরূপে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। তিনি ভগবানের করুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ। জীব উদ্ধারের জন্য শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ তাঁর নির্বাচিত ব্যক্তিকে শক্তিসঞ্চার করে পাঠান। সেই অসমোর্দ্ধ্ব মহাশক্তি না এলে মায়াশক্তির কাছ থেকে জীবকে উদ্ধার করে ভগবৎ পাদপদ্মে নিয়ে যেতে পারবে না। তিনি এখানে ভগবৎ আজ্ঞায় এসে নিত্যনতুন ভাবে ভগবৎ লীলাকথা কীর্ত্তন করেন। এই বাণী বেণু শ্রবণে জীবের স্বরূপ জাগরণ হয়।

জীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপস্বার্থে ধাবিত হয়ে অমঙ্গল বরণ করছে। এই অমঙ্গলপূর্ণ অভক্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য করুণাময়

ভগবান্ এই প্রপঞ্চে শ্রীমদ্ভাগবতকে অবতীর্ণ করালেন। শুদ্ধভক্তির আচার্য্যগণ বহু যত্ন করে এই পৃথিবীতে শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্মের বীজ বপন করেছেন। তাঁরা কর্ম্মের বীজ, জ্ঞানের বীজ, অন্যাভিলাষের বীজ নাশ করে শুদ্ধভক্তি কল্পলতিকার বীজ বপন করেন। এই সদ্‌গুরুর অবতরণ নিত্য। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সদ্‌গুরুর মাধ্যমে এই ভাগবতধর্ম জীবকুলকে শিক্ষা দেন। জীব কিরূপে অনাত্ম ধর্ম থেকে আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে তা ভাগবতধর্মে অকৃত্রিমরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। সেই ভাগবতধর্ম কালক্রমে যখন প্রলয়ে নষ্ট হয়ে যায় তখন শ্রীভগবান্ পুনঃ এই ভাগবতী বাণী জগতে প্রকট করেন।

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।।"

কালক্রমে প্রলয়ে ভক্তিবাণী নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বহির্জগতের নানা প্রকার ইন্দ্রিয় তাড়নায় জীব কৃষ্ণ বিস্মৃত হয়েছিল। তখন সর্বপ্রথম ব্রহ্মার হৃদয়ে এই বেদবাণী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রকাশ করেছিলেন। ব্রহ্মাকে তিনি যা উপদেশ করেছিলেন-তাই বেদবাণী। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র ব্রহ্মাদি গুরুপরম্পরা ক্রমে সম্প্রদায়ে যে স্বতঃসিদ্ধ বেদ পাওয়া যায়-তাকে আম্নায় বাণী বলে। এই বাণী নিত্য, সনাতন, ত্রিকাল সত্য। ব্রহ্মা হতে এই আম্নায় বাণীর স্রোতধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বয়ে চলছে এবং চলতে থাকবে। ভূতলে এই গুরুপরম্পরার নিত্যত্ব অত্যাশ্চর্য্য তো বটেই পরন্তু বড়ই বিচিত্র ও মধুর। এই ধারার প্রবর্ত্তক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁর ইচ্ছায় এই পরম্পরার আবির্ভাব বলে এর নিত্যত্ব। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত বেদবাণীই আম্নায় এবং এই বাণী তাঁর ইচ্ছায় যে পরম্পরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাকে আম্নায় পরম্পরা বা আম্নায়বাণী বলে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর 'দশমূল শিক্ষা'য় বলেছেন,-"আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃসাক্ষাদ্ব্রহ্মবিদ্যেতি বিশ্রুতাঃ। গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্তাঃবিশ্বকর্ত্তুর্হির্ব্রহ্মণঃ।।"(শ্রীভক্তিবিনোদ

কারিকা) বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা হতে গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা-নাম্নী শ্রুতি সকলকে আম্নায় বলা হয়। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাস পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি।।" (বৃহদারণ্যক ২/৪/১০) মহাপুরুষের নিঃশ্বাস হতে চতুর্বেদ ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষদ শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা সমস্তই নিঃসৃত হয়েছে। 'ইতিহাস' শব্দে রামায়ণ, মহাভারতাদি। 'পুরাণ' শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত শিরস্ক অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। 'উপনিষৎ' শব্দে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন প্রভৃতি একাদশ উপনিষৎ। 'শ্লোক' শব্দে প্রধান প্রধান তত্ত্বাচার্য্য কৃত বেদার্থ সূত্র সকল। 'অনুব্যাখ্যা' শব্দে সেই সূত্র সম্বন্ধে আচার্য্যগণ কৃত ভাষ্যাদি ব্যাখ্যা। এই সমস্তই 'আম্নায়' শব্দে কথিত। আম্নায় শব্দের মুখ্যার্থ বেদ।

" স্বতঃ প্রমাণ বেদ--প্রমাণ শিরোমণি।
লক্ষণা করিতে স্বতঃ প্রমাণতাহানি।।"

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন, - "বেদ সংজ্ঞিতা বাণী আমি প্রথমে ব্রহ্মাকে বলেছিলাম। তাতেই আমার স্বরূপ নিষ্ঠ বিশুদ্ধ ভক্তিরূপ জৈবধর্ম কথিত আছে। সেই বেদ সংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা। প্রলয়কালে তা বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় সৃষ্টি সময়ে আমি তা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি। ব্রহ্মা তা স্ব-পুত্র মনু প্রভৃতিকে বলেন। ক্রমশঃ দেবগণ, ঋষিগণ, নরগণ, সকলেই সেই বেদ সংজ্ঞিতা বাণী প্রাপ্ত হন। ভূতসকল ও ভূতপতি সকল সত্ত্ব, রজ, তমোগুণোদ্ভূত পৃথক পৃথক প্রকৃতি লাভ করে পরস্পর ভিন্ন হয়েছেন। সেই প্রকৃতি ভেদানুসারে পৃথক পৃথক অর্থের দ্বারা নানা বিচিত্র মত প্রকাশিত হয়েছে। 'হে উদ্ধব, যাঁরা ব্রহ্মা হতে গুরু- পরম্পরাক্রমে সেই বেদ সংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যাদি প্রাপ্ত হয়েছেন, তারাই বিশুদ্ধমত স্বীকার করেন। অপর সকলেই মতভেদ ক্রমে নানাবিধ -

পাষণ্ডমতের দাস হয়ে পড়েছে।' ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, ব্রহ্ম-সম্প্রদায় নামক একটি সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হতে চলে আসছে। সেই সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত বেদ সংজ্ঞিতা বিশুদ্ধ বাণীই ভাগবদ্ধর্ম সংরক্ষণ করছে। সেই বাণীর নাম আম্নায় । যে সকল লোক 'পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ' ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্ম সম্প্রদায় স্বীকার করে না, তারা ভগবদুক্ত পাষণ্ডমত প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায় স্বীকার করতঃ যারা গোপনে গুরু- পরম্পরা- সিদ্ধ প্রণালী স্বীকার করেন না, তারা কলির গুপ্তচর। সমস্ত ভাগ্যবান্ লোকই গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত আপ্তবাক্য আম্নায়কেই প্রমাণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণনা করেন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা । যারা এ প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তারা শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রধান শত্রু।"

শ্রীগুরুদেব বেদবক্তা । সদ্গুরু না হলে এই বিশুদ্ধ ভাগবদ্ধর্ম শিক্ষা দিতে পারবেন না। যতক্ষণ মনোধর্ম দ্বারা চালিত হবে বা মনোধর্মে আবদ্ধ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মনের ছাঁচে গড়ে ভাগবত ধর্মকে শিক্ষা দেবে। সেইজন্য কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকামী আম্নায়ধারার আচার্য্য হতে পারেন না। এরা ভাগবত ধর্মের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি- নিজে স্বরূপস্থ হতে পারেন নি - অপরকে কি করে শিক্ষা দিবেন? আম্নায় ধারায় স্নাত না হয়ে আজকাল অসংখ্য গুরুর উৎপত্তি হয়েছে। যার ফলে স্বরূপ-বিভ্রান্ত জীব আরও ভ্রান্ত হয়ে অমঙ্গলের পথে ধাবিত হচ্ছে। এরা জীব উদ্ধারের পরিবর্তে জীবকে মায়ায় আবদ্ধ করে জগজ্জঞ্জাল বৃদ্ধি করছে। সদ্গুরুর প্রথম কাজই হলো--জীবের মনোধর্ম নাশ করা, বেদের পথে, আম্নায়ের পথে পরিচালিত করা। জড়-হেয়-নশ্বর মনোধর্ম রহিত নিত্য সনাতন বাণীই আম্নায়। শব্দব্রহ্ম ও পর ব্রহ্মের অনুভব না থাকলে আচার্য্য ভাগবত ধর্মের ব্যাখ্যা বা ভাষ্যাদি

করতে পারবেন না। এই জন্য মনোধর্মের দ্বারা চালিত হয়ে নানা অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীগুরুপরম্পরা ব্যক্তিই হরিদয়িত অর্থাৎ শ্রীহরির কৃপা প্রাপ্ত । শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে এঁদের নিজজন বলে গ্রহণ করে তত্ত্ব বলছেন। বেদ বা বেদানুগ শাস্ত্র যারা মানে না তারা নাস্তিক । যারা শ্রীগুরু পাদপদ্মের শ্রৌতবাণীকে বেদবৎ মানে না, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করে না তারা নির্বিশেষবাদী পাষণ্ড। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করলেন - তা আম্নায় জ্ঞান বা সম্বন্ধ জ্ঞান বা শাস্ত্র জ্ঞান বা অদ্বয়জ্ঞান। আম্নায় জ্ঞান বলতে--সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনকে বুঝায়। ব্রহ্মা হতে শ্রীনারদ-শ্রীব্যাস-শ্রীশুকদেব- শ্রীমধ্বাচার্য ক্রমান্বয়ে লক্ষীপতি, মাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী আদি হয়ে এই ধারায় শ্রীগৌরসুন্দর এলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অকৃত্রিম ভাষ্য সর্বপ্রথম সার্বভৌমের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। এই শ্রীগৌরসুন্দরই পরমোপাস্য বস্তু--জগতের সকলেরই শেষ উপাস্য বস্তু। শ্রীমহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর হতে জগতে গৌড়ীয়গণ প্রকাশিত হয়েছেন। সেই স্বরূপ-দামোদরের পরম প্রিয় শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু। তাঁর থেকে শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় সম্প্রদায় এসেছে। এভাবে শ্রীসনাতন-শ্রীজীব-শ্রী রঘুনাথ-শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ-শ্রীনরোত্তম ঠাকুর-শ্রী বিশ্বনাথ-শ্রী বলদেব-শ্রী উদ্ধবদাস-শ্রীমধুসূদন-শ্রীজগন্নাথ- শ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রী গৌরকিশোর-শ্রীবার্ষভানবী দয়িতদাস শ্রীল প্রভুপাদ-শ্রীল আচার্য্যদেব-শ্রীল তীর্থ মহারাজ-শ্রীল গুরুমহারাজ পর্যন্ত্য সকলে আম্নায় ধারার আচার্য্য। এঁদের আচরিত ও প্রচারিত ভক্তিই উত্তমা কৃষ্ণভক্তি। এই গুরুপরম্পরার আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নির্মল অকিঞ্চনা অহৈতুকী কেবলা সেবা প্রবৃত্তি বিদ্যমান। যেখানে এই অকিঞ্চনা অহৈতুকী সেবা প্রবৃত্তি সেখানেই আচার্য্যত্ব প্রকটিত। অন্য কেউ আচার্য্য হতে পারবে না। কেন হতে

পারবে না? তাঁদের কোন মৌলিক অবদান নেই। তথাকথিত ব্যক্তিগণ আচার্য্য নামে অভিহিত হয়ে ব্যাখ্যা, টীকা করেছেন কিন্তু তাদের ব্যাখ্যার মধ্যে চেতনের কোন অনুভূতি বা মৌলিকত্ব বা অভিনবত্ব নেই। কেবল প্রাণহীন, অন্তঃসারহীন তোতা পাখীর বুলির মতো শব্দ উচ্চারণ করলেই আম্নায় ধারার আচার্য্য হওয়া যায় না। তারা প্রতিষ্ঠার দাস হয়ে পাঠ- ব্যাখ্যা-কীর্ত্তনাদি করে সেইজন্য কথায় প্রাণ দান করতে পারেন না। আর যাঁরা আম্নায় ধারার আচার্য্য তাঁদের বাণী সব গোলোক থেকে অবতীর্ণ হয়। কথারূপে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। অপ্রাকৃত রাজ্য থেকে যা অবতীর্ণ হয় - সেটাই মৌলিক। সেই বাণীই আম্নায়।

"আম্নায় ধারার অবিচ্ছিন্নত্ব না থাকলে শিষ্যত্বেরও নিত্যত্ব থাকতে পারে না। গুরু ও শিষ্য পরম্পরা বর্ত্তমানকাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে না থাকলে কৃষ্ণানুশীলন বন্ধ হয়ে যায়। তখন নাস্তিকতার সাম্রাজ্য অরাজকতার আবির্ভাব হয়।" (শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা ৪র্থ খণ্ড - ২১১পৃ:) বেদ কল্পতরুর প্রপক্ক ফল- শ্রীমদ্ভাগবত - যাহা বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। শ্রীল আচার্য্যদেব বলেছেন, -" আম্নায় শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত। আম্নায় শব্দে শ্রুতি অথবা বেদের উদ্গানকারী গুরুপরম্পরা। গৌড়ীয়গণের শ্রৌত পথের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র মূল উদ্গানকারী - শ্রীল স্বরূপ দামোদর। ইনি গৌড়ীয়গণের শ্রুতির মূল ঋষি।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রের ভাষ্য বৈধী ভক্তির আচার্য্যগণ বহুল ভাবে প্রচার করেছেন। কিন্তু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সময় হতে রাগানুগা ভক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁর পারিষদবর্গ এসে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য, কারিকা, অনুবৃত্তি, টীকা ইত্যাদির দ্বারা রাগানুগা ভক্তির বিপুল প্রচার করেন। ষড়গোস্বামী যে সব গ্রন্থ রচনা করেছেন তা

শ্রীমদ্ভাগবতের সার। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, উৎকলিকাবল্লরী, হংসদূত, স্তবমালা, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের বৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের ষট্‌সন্দর্ভ, গোপালচম্পু, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের স্তবাবলী, বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি ইত্যাদি সকলই শ্রীমদ্ভাগবতের অকৃত্রিম ভাষ্য। এ সকলই আম্নায় বাণী। শ্রীমদ্ভাগবত যে 'রসমালয়ং' তার সুগভীর আস্বাদন মাধুরী গোস্বামিগণের লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে। যাঁরা রহস্যবিদ্, তত্ত্ববিদ্, সিদ্ধান্তবিদ্, নিখিল শাস্ত্র তাৎপর্যবিদ্ তাঁরা সকলেই আম্নায়। 'আম্নায়' শব্দে গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবতকে বুঝায়। আম্নায় বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব। আম্নায় পরম্পরার গুরু ব্যতীত এই শ্রীমদ্ভাগবতের সুগভীর [illegible] হৃদয়ঙ্গম করাতে পারবেন না। "শ্রীমদ্ভাগবত একাধারে সমগ্র শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য-গ্রন্থ। সেই গ্রন্থ রচয়িতা বেদব্যাস নিখিল সাত্ত্বত সম্প্রদায় অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানের নিত্য সত্তা, নিত্য আনন্দ ও নিত্যচেতন স্বরূপে বিশ্বাস ও অনুশীলনকারী তাঁহাদের আরাধ্য, সেব্য ও অনুশীলনীয় বস্তু। সেই ব্যাস স্নিগ্ধ সেবাকাঙ্ক্ষী বিশ্রম্ভসেবকের নিকট তাঁহার গূঢ় সম্পত্তি অর্থাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য্য-সম্পত্তি সংরক্ষণ করেন, তিনি আবার তৎপরবর্ত্তী যোগ্যশিষ্যের নিকট সেই সম্পত্তি প্রদান করেন। এই প্রণালীতে যে ধারায় শিষ্যপারম্পর্য্যক্রমে বাস্তব সত্য সংরক্ষিত হয়, তাহাকে আম্নায়ধারা বলে বা শ্রৌতপথ বলে, অর্থাৎ শ্রুতি ও তদনুগ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে পরম্পরায় চলিয়া আসে, তাহাকে আম্নায় ধারা বলে।" (শ্রীল আচার্য্যদেব)

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।।" (শ্রীভাঃ)

এইশ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বলেছেন,- "পরমোর্দ্ধচূড়াতঃ শ্রীনারায়ণাদ্ব্রহ্মশাখায়াং, ততোঽধস্তান্নারদশাখায়াং, ততো ব্যাসশাখায়াং, ততঃ শুকমুখং প্রাপ্যাতপাৎ মধ্বিবামৃতদ্রব-সংযুতং, শুকেনৈব তেন স্বচঞ্চবামৃতনিষ্ক্রমণার্থং দ্বারমপি কৃতম্ অথচ তেনাস্বাদিতত্বাদতিমধুরং ততঃ সূতাদিশাখাতঃ শনৈঃ শনৈঃ পতনাদখণ্ডিতম্। তেন গুরুপরম্পরাং বিনা স্ববুদ্ধিবলেনাস্বাদনে শ্রীভাগবতস্যাখণ্ডিতত্বে পানাসক্তিঃ সূচিতা।" গুরু-পরম্পরা ব্যতীত নিগমকল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবতের আস্বাদন কেউ করতে পারবে না। অখণ্ডিত অর্থাৎ নিত্য পরম্পরাযুক্ত। বিচ্ছেদ বা ব্যবধান রাহিত্য। এই নিত্য পরম্পরাকে বাদ দিয়ে যদি কেউ শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদন করতে যায় অর্থাৎ 'স্ববুদ্ধিবলে'র দ্বারা আস্বাদন করতে যায় তবে সে হয় কর্মী, জ্ঞানী, না হয় নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকারী যোগী হয়ে যাবে। কারণ 'শ্রীমদ্ভাগবতস্যাখণ্ডিতত্বে' শ্রীমদ্ভাগবত অখণ্ড। নিজে নিজে আস্বাদন করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত নিত্য পরম্পরায় অতি রসযুক্ত হয়ে আসছে। সেই ধারায় প্রণত হয়ে পান করতে হবে। এজন্য স্বরূপ-দামোদর বললেন, -

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতকে তিরস্কার করে শিক্ষা দিলেন যে শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণ আস্বাদন করতে হলে ভক্ত ভাগবতের আশ্রয়ে অর্থাৎ গুরু-পরম্পরায় আস্বাদন করতে হবে। স্ব-বুদ্ধি বলের দ্বারা ভাগবত পাঠককে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বললেন,-

"ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধি নাশ।"

শ্রীচৈ: ভা: ম: - ২০/১৫০)

"ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধি নাশ।"

(ঐ, ম: - ২১/২৮)

সুতরাং শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করে কখনও নিত্য বাস্তব মঙ্গল লাভ হয় না। কেবলা ভক্তি একমাত্র শ্রৌতপথেই লাভ হয়ে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের বেদস্তুতিতে ১০/৮৭/২১ শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলেছেন--সরোজহংসানাং শ্রীশুকদেবাদীনাং যানি কুলানি শিষ্যোপশিষ্যপরম্পরাঃ তেষাং সঙ্গেন বিসৃষ্টমাত্রগৃহাঃ" যাঁরা তোমার চরণকমলের মাধুর্য আস্বাদপরায়ণ ভাগবত পরমহংসগণের শিষ্যোপশিষ্য পরম্পরার সঙ্গ বলে গৃহত্যাগী হয়েছেন, তাঁরা সকলে ভক্তি লাভ করেছেন। শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করলে জীবনে উৎপাত আনয়ন করে।এই আম্নায়ধারা বা শ্রৌতপথ বা গুরুপরম্পরার নিত্যত্ব নির্বিশেষবাদী ব্যতীত ভক্তি পথের পথিকগণ সকলেই স্বীকার করেন। এই আম্নায় বা গুরুপরম্পরা প্রণালী রক্ষা করাই আচার্য্যের একমাত্র কাজ। সম্প্রদায় রক্ষা বা ভগবদ্ধর্ম রক্ষা একমাত্র বিশুদ্ধবাণী বা আম্নায় বাণী রক্ষার দ্বারাই হয়ে থাকে । এজন্য আচার্যের আর একটি নাম ভগবদ্ধর্ম সংরক্ষক বা সম্প্রদায় সংরক্ষক। যাঁরা শ্রীরূপানুগ ধর্মের পালক ও শিক্ষক অর্থাৎ শ্রীরূপানুগ ধর্মের বাণীকে অনাবৃত ও নির্মলভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন— তাঁরাই আচার্য্য।

শ্রীল আচার্য্যদেব বলেছেন, - "ভাগবত পরম্পরা -- শিক্ষাগুরু পরম্পরা, ইহা দীক্ষাগুরু পরম্পরা নয়। দীক্ষাগুরু সম্বন্ধজ্ঞান দান করেন আর অভিধেয় ও প্রয়োজন শিক্ষা দেন শিক্ষাগুরু। তিনি শ্রীনামভজন শিক্ষা দেন। শ্রীল কৃষ্ণদাসের প্রিয় শ্রীনরোত্তম ঠাকুর আম্নায় ধারায় এলেন অথচ শ্রীনরোত্তমের দীক্ষাগুরু শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী। শ্রীল নরোত্তমের পর শ্রীল বিশ্বনাথ। গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি তিন পুরুষের পর শ্রীল বিশ্বনাথ। এটা পাঞ্চরাত্রিক পরম্পরা নয়- ইহা শিক্ষাগুরু পরম্পরা ভাগবত পরম্পরা।" এঁর পরে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ গীতাভাষ্য ও গোবিন্দভাষ্যের রচনা করে শ্রৌত পথের মৌলিক অবদান সংরক্ষণ

করেন। এই সব রূপানুগাচার্য্যগণ ভাষ্য রচনা না করলে মনোধর্মী, অন্যাভিলাষী সম্প্রদায় ভাগবত ধর্মকে বিকৃত করে দিত। শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তের অভিনব মৌলিক ভাষ্য বা ব্যাখ্যাদি ব্যাসাচার্য্যগণের একমাত্র কাজ।

করুণাময় শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে পৌঁছানোর একমাত্র সেতু হল--বিপ্রলম্ভ নাম ভজন। অসহায় শিশু যেরূপ মাতার স্তন্য দুগ্ধ পান করার জন্য আকুল ও অসহায় হয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে থাকে তদ্রূপ নিত্যপ্রভু, নিত্যপতি, নিত্যস্বামী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে হারিয়ে আমরা এ ভবসমুদ্রে অসহায় শিশুর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি, এটা অনুভব করে প্রবল বেগে অজস্র অশ্রু বিসর্জন করতে হবে। আমাদের আত্মার স্বাভাবিক ভজন হল-বিচ্ছেদগত বেদনা। আমাদের আবৃত স্বরূপকে জাগিয়ে আত্মার বিচ্ছেদগত ভজন দেখানোর জন্য শ্রীরূপানুগ আচার্য্যগণ বিপ্রলম্ভ ভজন পদ্ধতি দেখাচ্ছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, 'চিদ্‌বিপ্রলম্ভই জীবের একমাত্র সাধন।' এই বিপ্রলম্ভই জীবের পক্ষে স্বাভাবিক ভজন। রূপানুগ ধারার আচার্য্যগণ সকলেই সেই গোলোকের শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিজজন, তাঁদের কায়ব্যূহ। সদ্‌গুরু বা আম্নায় ধারার গুরু ব্যতীত অন্য কোন গুরুর কথা বলা হচ্ছে না। তথাকথিত যদ্বা-তদ্বা গুরুর কথা বলা হচ্ছে না। তারা নিজেরা ভগবান্‌কে দর্শন করে নি, জীবকে কি করে ভগবদ্ রাজ্যে নিয়ে যাবে। তারা জীবের স্বরূপ জাগরণ করাতে পারবে না। জগতে আজকাল বহু গুরুর মেলা বসে গেছে। হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাজারে, ঘরে-ঘরে গুরুর ছড়াছড়ি। ভগবৎ সেবা পথে বাধা প্রদানকারী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের ন্যায় গুরুর কথা বলা হচ্ছে না। সেজন্য আম্নায় ধারার আচার্য্যের উৎকর্ষ, বৈশিষ্ট্য, চমৎকারীতা বলা হচ্ছে। এঁরা অপ্রাকৃত দিব্য চেতনময়ী বাণী জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে ঘুমন্ত সুপ্ত আত্মাকে জাগ্রত করে কৃষ্ণ অভিসারে

য়ে যান । শ্রীকপিলদেব মাতাকে বলছেন, ---

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।"

ভগবানের বীর্য্যবতী কথা অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি সমন্বিত কথা
াযে্যর সকল অনর্থকে দূর করে নির্মল সুন্দর পবিত্র অর্থাৎ ভক্তির
ারা হৃদয়কে শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল করে সেখানে প্রেম ভক্তির আবির্ভাব
রান এবং দিব্য অপ্রাকৃত দেহ দান করে গোলোকে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের
ীচরণকমলের সেবায় চিরকালের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনিই
দ্‌গুরু বা আম্নায় ধারার গুরু। এইসব আচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণকে
াওয়ার অভ্রান্ত ও সহজতম উপায় দেখালেন - এই বিপ্রলম্ভ নাম
জন। এই ভজন শিক্ষা দেবার জন্য তাঁদের ভূতলে অবতরণ।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে কৃপাশক্তি রাজচক্রবর্ত্তী-
ড়ামণি। এই কৃপা শক্তি বা অনুগ্রহা শক্তি মূর্ত্তি ধারণ করে গুরু
রূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মা থেকে মদীয় গুরুপাদপদ্ম
শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গোস্বামী ঠাকুর পর্য্যন্ত সকলে কৃপাসিন্ধু,
দয়াসিন্ধু, গুণসিন্ধু, প্রেমসিন্ধু ও রসসিন্ধুর আগার । এইসব গুরুবর্গের
অহৈতুকী কৃপায় আমরা শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের কুঞ্জসেবা অত্যল্প কালের
মধ্যে লাভ করতে পারি। ভগবানের কৃপার প্রথম প্রকাশ শ্রীগুরুদেব।
শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর কায়ব্যূহগণই শ্রীরূপানুগ ধারার আচার্য্য।
এই রূপানুগ ধারার মৌলিক অবদান বা বৈশিষ্ট্য যে তাঁরা
শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবোপযোগী যুগপৎ দুটো
স্বরূপের দেহ দান করে সেবায় নিযুক্ত করেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর
পূর্ব পর্যন্ত জগতে বৈধীভক্তির শিক্ষা আচার্যগণ দেখিয়েছেন। তারপর
শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ বিপ্রলম্ভ প্রেমকল্পতরুর অঙ্কুররূপে প্রকাশিত

হলেন। শ্রীগৌরসুন্দর অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বল প্রেমদান করলে তৎ প্রিয় পারিষদ শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দ এই প্রে প্রদান কার্য্যকে পরিপুষ্ট করেছিলেন।

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট অর্থাৎ হৃদ্গত ভাবকে পরিপ বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন তাঁর একমাত্র অন্তরঙ্গ গূঢ়রহস্য রসবেত্তা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুবর।

"প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততানরূপে স্ববিলাসরূপে।

রূপানুগাচার্য্যগণ সকলেই মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট পরিপূরণকার্য ষড়গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল বিশ্বনা শ্রীল বলদেব এঁরা বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট প্রচ করেছেন। তাঁদের বিপ্রলম্ভ প্রেম বিভাবিত দিব্য ভজনচরিত রূপানুগা ভজন প্রণালী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও চমৎকারপূর্ণ আমাদের নি আস্বাদনের বস্তু। তাঁদের চরিতাবলী নিত্য পূজনীয়, নিত্য শ্রবণী নিত্য স্মরণীয়, নিত্য বন্দনীয় ও নিত্য আস্বাদনীয়। বিপ্রলম্ভ প্রেম ভজন মাধুরীর নিত্য ধ্যান করলে আমাদের হৃদয়ে সেই অপ্রাকৃ বিরহের কণা উদিত হবে। তাঁদের অসমোর্দ্ধ দিব্যোন্মাদ লীলা মধুরি হৃদয়ে নিত্য স্ফূর্ত্তি লাভের আশায় কৃপা প্রার্থনা করি। তাঁদে শ্রীচরণকমলকে হৃদয়ে ধারণ ও বরণ করে কৃপা প্রার্থনা করে গ্র আরম্ভ করছি। তাঁদের চরণকমলে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে এ গ্রন্থ রচনার প্রয়াস করছি। তাঁদের আজ্ঞায় এই কার্য্যে সাহসী ব্রতী হচ্ছি। শ্রীল গুরুদেব ও রূপানুগাচার্য্যগণের অমায়ায় কৃ বর্ষিত হলে তাঁদের প্রীতিকর ও সুখকর সেবা রচনা করা সহজ হ

"গ্রন্থের আরম্ভে করি 'মঙ্গলাচরণ'।

গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান, - তিনের স্মরণ।।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ।।”

শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট আচরণকারী শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ বিপ্রলম্ভ শ্রীনাম ভজনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। শ্রীনাম ভজন ছাড়া অন্যান্য কোন ভজনকে তাঁরা অঙ্গীকার করেন নি। মাথুর বিরহিণী শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী তাঁর প্রিয়তম দয়িত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বিপ্রলম্ভ ধ্বনি বা আহ্বানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করেন, আরাধনা করেন। বিপ্রলম্ভ নাম ভজনের দ্বারা অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আরাধনা হয়। সর্বেন্দ্রিয়ে সর্বতোভাবে সর্বক্ষণ নিশ্ছিদ্র সেবা এই নাম ভজনের দ্বারা হয়। শ্রীগৌরসুন্দর নিজে আচরণ মুখে শিক্ষা দিয়েছেন। তা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর ‘ভজন রহস্যে’ অষ্টযামে সেই শিক্ষাকে শ্রীনাম ভজনের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও সুন্দররূপে বর্ণন করেছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদগত ভজনই আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম। এই নাম ভজনের দ্বারা আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ প্রস্ফুটিত হয়। বিরহের মধ্যে মহামিলনের সেতু রচিত হয়। সেতু রচনা শিক্ষামৃত অনুসারে শ্রীরূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথ-কৃষ্ণদাস-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-উদ্ধব-মধুসূদন-শ্রীলজগন্নাথ-শ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রীলগৌরকিশোর-শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর-শ্রীল আচার্য্যদেব-শ্রীল তীর্থ গোস্বামী ঠাকুর- শ্রীল ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গোস্বামী ঠাকুর সকলেই অনুগমন করে শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্ট ভূতলে স্থাপন করে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রভূত সুখবিধান করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় এই ধারা কখনও প্রবলাকারে, কখনও ক্ষীণাকারে চলতে থাকে। যখন ধারা ক্ষীণাকার হয় তখনও রূপানুগ ধারা সংরক্ষক থাকেন। তখন যে ধারা ছিন্ন হয়ে যায় তা নয়, অবিচ্ছিন্নভাবে এর প্রবাহ চলতে থাকে। সাধন সিদ্ধ কখনও এই ধারা সংরক্ষণ করতে পারে না।

একমাত্র নিত্যসিদ্ধ মঞ্জরী ছাড়া রূপানুগ ধারা কেউই সংরক্ষণ কর
পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ শত শত বার বলেছেন, - " শ্রীরূপা
শ্রীভক্তিবিনোদ ধারা কখনও রুদ্ধ হবে না। " কোন দিনই শ্রীরূপা
আম্নায়ধারায় মহান্ত আচার্য্যের নিত্য প্রাকট্যরূপ মহাবদান্যলীলা
হয় নি বা হবে না। কেবল তৃণাবর্ত্ত রূপ ভারবাহী অসাধুগণই তাঁ
দেখতে পায় না। নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণ যা বলে যাচ্ছেন তা
বাণী - ত্রিকাল সত্য। তাঁরা ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিকালদ্রষ্টা। তাঁদের ব
কখনও মিথ্যা হবে না। এক আচার্য্যের অপ্রকটের পর তৃণাবর্ত্ত
দৈত্যের নাস্তিক্যবাদ ও অপসিদ্ধান্তের ধূলিরাশির অপপ্রচারের দ্ব
গৌড়ীয় গগনের পরবর্ত্তী আম্নায়-সূত্র-সংরক্ষণকারী আচার্য্য
অন্ধকার বা আবৃত করার চেষ্টা করে। প্রত্যেক আচার্য্যের অপ্রক
পর এই তৃণাবর্ত্ত দলের অপপ্রচারকারী সম্প্রদায় থাকে। তারাই
বিমল শুদ্ধভক্তিতে নিজের মনের আবিলতা ও স্বার্থপরতাকে মি
করে ভক্তি বলে প্রচার করতে চায়। কিন্তু ভগবৎ ইচ্ছায় প্রপা
মহান্ত গুরুর অভাব কোনদিনও হবে না। এই সব মনোধ
অন্যাভিলাষ, মিছাভক্তি থেকে শুদ্ধভাবে ভক্তিকে সংরক্ষণ কর
আচার্য্যের প্রধান কাজ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জৈবধর্ম্মে বলেছে
" সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন । কেবল অসাধুগণই তাঁদিগ
চিনতে পারে না বলে সাধুসঙ্গ দুর্লভ হয়। "

কালক্রমে শ্রীরূপানুগ ধারায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকু
আবির্ভাব হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগত ধার
শ্রীভক্তিবিনোদ ধারা নামে পরিচিত। এই ধারার আচার্য্যগ
অসমোর্ধ্ব বৈশিষ্ট্য, চমৎকারীতা, অনবদ্য ভজন মাধুরী আস্বাদ
আমাদের আলোচ্য বিষয় বস্তু। বিশেষ করে তাঁদের দিব্যোন্মাদ
নামভজন মাধুরী কিঞ্চিৎ আস্বাদন করার প্রয়াস করছি। সমগ্র ভ
পদ্ধতি বর্ণনা করতে কেউই পারবে না। এ প্রসঙ্গে শ্রীল আচার্য্য

বলেছেন, — ব্রহ্মাণ্ডের ভূমি যদি লেখার কাগজ হয় এবং সপ্ত সাগরের জল যদি কালি হয় আর গৌরীশৃঙ্গ পর্বত যদি কলম হয় তাহলেও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অসমোর্ধ্ব দয়াসিন্ধুর একবিন্দুও বর্ণন করা যাবে না।

"ভকতিবিনোদ দয়া করহ বিচার ।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।।"

শ্রীভক্তিবিনোদ ধারার অনবদ্য অত্যদ্ভুত অনির্বচনীয় মাধুরী যা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে নিজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বা অবদান স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষিত করছেন। এই ধারার সৌন্দর্য, মাধুর্য, কারুণ্য, ঔদার্য ইত্যাদির চমৎকারীতা যেদিন আমরা উপলব্ধি করতে পারবো সেদিন আমরা রূপানুগগণে গণিত হবো। শ্রীভক্তিবিনোদ ধারার আচার্য্যগণের অসামান্য অবদান হলো শ্রীরাধাদাস্য। তাঁরা প্রত্যেক জীবকে এই রাধাদাস্য—ভক্তি শিক্ষা দান করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকটি শিক্ষাই শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে রাধাদাস্য সেবা দান করা। সেখানে আমাদের নিত্য বাসস্থান— এই স্বরূপ উদ্বোধন করাচ্ছেন। সেখানে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যই তাঁরা এসেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বললেন যে, শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্য ব্যতীত জীবের ক্ষীণ অধিকার লাভ হয়। শ্রীরাধাদাস্যই জীবাত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোচ্চ বিকাশ ও প্রাপ্তি। এখানে আত্মার চরম ও পরম বিশ্রান্তি। চেতনের তীব্রগতি— দ্রুততম গতি — ক্রমবর্দ্ধমানগতি— সেবার পরিপূর্ণতম গতিশীলতা। আত্মার এরূপ একটা অবস্থা প্রাপ্তি হয়।

এই ধারার আচার্য্যগণ শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা মঞ্জরী বা দাসী। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, - 'শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ বার্ষভানবী।' শ্রীমতী ছাড়া কেউ কৃষ্ণ বশীকরণরূপ প্রেম সেবা শিক্ষা দিতে পারেন না। একমাত্র শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী ও তাঁর অনুগতা নর্ম মঞ্জরীগণ ছাড়া এই পরম রহস্যঘন শ্রীরাধাকুণ্ডে কারও প্রবেশ অধিকার নেই।

প্রেমের সর্বোচ্চ অসমোর্ধ্ব বিলাস এই রাধাকুণ্ডে সংঘটিত হয়। সেখানে প্রেমের পরিপূর্ণতম প্লাবন বা বন্যা নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে। আত্মা তার অনর্গল বিচিত্র স্বৈরিণী সেবা বিলাসে মত্ত হয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। আত্মাটা স্বাধীনতা পেল অর্থাৎ স্বৈরিণী সেবা প্রাপ্ত হল। জীবাত্মার এত বড় ভূমিকা দান করার জন্য শ্রীভক্তিবিনোদ ধারার আচার্য্যগণের আবির্ভাব। জীবকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনে ধনী করতে চান তাঁরা। এঁরা সকলে রসমধুরিমার আচার্য্য।

আমরা প্রথমে রূপানুগবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চিদ্ বিপ্রলম্ভময় দিব্য ভজন চরিতামৃত আস্বাদন করার যত্ন করছি। আজকের দিনে আমরা যে এই অপ্রাকৃত জগতে এসে যা দেখছি, যা শ্রবণ করছি, যা কীর্ত্তন করছি, যা আস্বাদন করছি – এ সবই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতুলনীয় অনন্যসাধারণ মহা মহা অবদান। তাঁর অবদানের কথা আমার মতো সর্বপ্রকারে অযোগ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তি কি প্রকাশ করবে, – কেবল তাঁর ভজন মাধুর্য্যসিন্ধুর তীরে বসে ভাণ্ডস্থিত মধু আস্বাদন করার চেষ্টামাত্র।

শ্রীভক্তিবিনোদের বিপ্রলম্ভ ভজনমাধুরী

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় তাঁর ধামে তাঁরই মনোঽভীষ্ট প্রচারার্থে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রত্যেক পরিকরের এক একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি শ্রীগৌরকরুণাশক্তি একথা সুগভীর সত্য। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রূপানুগত্ব, তাঁর প্রভাব, তাঁর করুণাশক্তি বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীল গুরুমহারাজ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবের রহস্য উদ্ঘাটন করে বলেছেন, – "ভক্তিপথ কোটি কন্টকাকীর্ণ। যখন এই ভক্তিপথ কন্টকাকীর্ণ হয়ে যায়, ভক্তি স্রোতের প্রবাহ যখন ক্ষীণ হয়ে যায়; তখন সেই ধারাকে পুষ্ট করবার দরকার হয়। শ্রীহরিনামের ধ্বনি যখন আর শোনা যাচ্ছে না, ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে; তখনই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর নিজজনকে নির্বাচন করে বলেন, – 'তোমাকে কিছু দিনের জন্য প্রপঞ্চে যেতে হবে, ঐ দেখ কীর্ত্তনের রোল ক্ষীণ হয়ে আসছে, তুমি ভূলোকে গিয়ে এই ক্ষীণ ভক্তি ধারাকে প্রবলভাবে প্রবাহিত করো। আমার যে ভক্তি নিত্যকাল চালু রয়েছেন, তাঁকে তুমি আবার লোকসমাজে উজ্জ্বলরূপে প্রচারিত করো। পৃথিবীতে যত নগরাদি গ্রাম আছে, সর্বত্র এই অমল হরিনাম প্রচার করো।' তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১২৪ বছর পূর্বে নদীয়া জেলায় শ্রীগৌরাবির্ভাব ক্ষেত্রের অনতিদূরে প্রকটিত হ'য়ে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট পূরণ করেছেন।' তিনি গৌরকরুণাশক্তি। শ্রীগোদ্রুমধামে তিনি শ্রীনামহট্ট স্থাপন করেছিলেন। "কলি যুগের ধর্ম – কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন।।" (চৈ:চ:)

কীর্ত্তনের রাজধানী শ্রীগোদ্রুমধামে স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জে তি অবস্থান করেই সর্বত্র নামপ্রেম বিতরণ করেছেন এবং এখন করছেন। স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জে তিনি নিত্য অবস্থান করেন। যাদে শ্রদ্ধা নেই, বহির্ম্মুখ, অন্যাভিলাষী এরূপ বহু ব্যক্তির শ্রদ্ধা উদ করিয়ে নাম প্রদান করেছিলেন - তিনি এত বড় দয়ালু। পরম করুণাম পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রাকৃত নিত্য পরমানন্দময় জগত থেকে এই প্রাকৃত হেয় - পুঁতিগন্ধময় -স্বার্থপরিপূর্ণ নিরানন্দময় জগতে নেমে এসেছিলেন কেবলমাত্র প্রেমভক্তির মন্দাকিনী ধারাকে প্রবল বেগে প্রবাহিত করতে। সেই অনবদ্য প্রেমধারায় অতুলনী অনাস্বাদিত প্রেম জগতের দুঃখী জীবকুলকে দান ও পান করানো জন্য এসেছিলেন। এই ঔদার্য্য লীলাতে তাঁর গৌরজনত্ব প্রস্ফুটি হয়ে পড়েছে। তিনি যে গৌরকরুণাশক্তি এটা ফল দেখেই বোঝ যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ধারায় প্রেম ভক্তি রূপ অপূর্ব ফল ফলছে এ ধারায় প্রতিটি শিষ্য অল্প সময়ের মধ্যে কতবড় সম্পদ লাভ করে দিব্যদেহে গোলোকে অবস্থান করছে। এই ধারায় আবির্ভূত আচার্য্যগণের আশ্রিত শিষ্যদের মধ্যে এই অমৃতময় ফল ফলছে এটা অন্ধকারে হাতড়ানোর ব্যাপার নয়। দিবালোকের মতো স্পষ্ট সত্য ও অনুভূতিপূর্ণ বাস্তবিক কথা। যেখানে শুদ্ধ নাম সংকীর্ত্তন রূপ ফল দেখতে পাওয়া যায় সেখানে কৃষ্ণশক্তির প্রকাশ আছে একথা উপলব্ধি করতে হবে।

" নাম ওমনি উদিত হয় ভকতগীত সামে।"

এই সব গৌরকরুণাশক্তি সঞ্চারিত মহাজনগণ তাঁরা যা বলেন - যা করেন - যা লেখেন সেখানেই কৃষ্ণশক্তির আবির্ভাব হয়। হরি সংকীর্ত্তনে কৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত হবেন - এটাই শুদ্ধ সংকীর্ত্তনের ফল তিনি কীর্ত্তনের মাধ্যমে, গ্রন্থের মাধ্যমে কৃষ্ণকে বিতরণ করেছেন।

তিনি সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশিত করেছিলেন।"

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ যে, গৌরহরির বিশেষ সেবার ভার নিয়ে জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা তাঁর স্বলিখিত চরিত্রের একটি ঘটনা হতে জানা যায়। ঠাকুর মাথুরমণ্ডলের কোন যামুন-পুলিন বনে নির্জন ভজন করার সংকল্প করেন এবং অব্যবহিত পরে তারকেশ্বরে গমন করেন। বৈষ্ণবরাজ তারকেশ্বর ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদকে রাত্রিতে স্বপ্নযোগে বলেন যে, -" তিনি শ্রীগৌরহরির ধামের সেবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁর সেই মূল কার্য্যই বাকি রয়েছে। সুতরাং তিনি কেন ব্রজমণ্ডলে যাবেন? "

শ্রীগৌরহরি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জন্যই ঐ সেবাটি রেখে গিয়েছিলেন । নতুবা যেস্থানে স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হলেন, যেস্থান হতে প্রেমের ঠাকুর বিশ্বভরে প্রেম বিতরণ করলেন অথচ সেস্থান লোকলোচনের কাছে অপ্রকাশিত রয়ে গেল। তাঁর ভার পড়ল ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের উপর। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরহরির নাম প্রচারের জন্য, গৌরধাম উদ্ধারের জন্য ও গৌরহরির কাম বর্দ্ধনের জন্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । শ্রীগৌরহরি কি বস্তু , গৌরহরির প্রকৃত সেবা কি, তা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র ও শিক্ষার অবতরণ না হলে এই যুগে কেউই বুঝতে পারতো না। শ্রীভক্তিবিনোদ গৌরহরির নাম, ধাম ও কাম মহাযজ্ঞের একাধারে হোতা , উদ্গাতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা। শ্রীল ঠাকুর গৌরহরির প্রিয়তম, গৌরহরির প্রকাশবিগ্রহ, গৌরহরির মনোঽভীষ্ট সংস্থাপক, গৌরহরির প্রেরিত মহাজন, গৌরহরির নয়নমণি ও গৌরহরির প্রাণারাম। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৌরজনত্বের এটাই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় শ্রীশ্যামসুন্দরের লীলা ও শ্রীশ্যামসুন্দরের লীলায় শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা দর্শন ও প্রদর্শন করতেন। তিনি

শ্রীগৌরধামকে অভিন্ন ব্রজধাম বলেছেন।

" বৃন্দাবনাভেদে নবদ্বীপ ধামে
বাঁধিব কুটীর খানি।
শচীর নন্দন চরণ আশ্রয়
করিব সম্বন্ধ মানি ।।"

তিনি অন্যত্র বলেছেন, --

" গৌড় ব্রজবনে ভেদ না দেখিব
হইব বরজ বাসী।
ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে
হইব রাধার দাসী।।"

শ্রীগৌরধামকে অভিন্ন রাধাকুণ্ড বলে নির্দেশ করেছেন ও তদ্দর্শ শ্রীগোদ্রুমধামকে আশ্রয় করে ভজন করেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনো ঠাকুর এ প্রসঙ্গে বলেছেন, – " শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণাশ্রয় কর কৃষ্ণের ভজন না করলে পরম পুরুষার্থ পাওয়া যায় না।" তিনি শ্রীগৌরভজনের পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন বলে কৃষ্ণ ভজন কর নিষেধ করেছেন তা নয়। তবে অনর্থগ্রস্থ জীব প্রথমে দয়াল ঠাকু শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের চরণাশ্রয় করে নিরপরাধে নাম করতে কর মুক্ত হলে কৃষ্ণ নাম ভজনের অধিকারী হন - এই কথা জানিয়েছে তা বলে কৃষ্ণ ভজন বাদ দিতে বলেন নি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছে - "মূল বৃন্দাবনেও কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ এই দুটি পৃথক প্রকো আছে। কৃষ্ণপীঠে যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুর্য প্রধ ঔদার্য লাভ করেছেন তাঁরা কৃষ্ণগণ, শ্রীগৌরপীঠে সেই সক নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণই ঔদার্য প্রধান মাধুর্য ভোগ করছে কোনস্থলে উভয়পীঠে স্বরূপ ব্যূহ দ্বারা তাঁরা বর্ত্তমান। আবার কো স্থলে একস্বরূপেই এক পীঠে আছেন, অন্য পীঠে থাকেন ন সাধনকালে যাঁরা কেবল গৌর উপাসক, সিদ্ধিকালে তাঁরা কেবল

ারপীঠে সেবা করেন; সাধনকালে যাঁরা কেবল কৃষ্ণ উপাসক, দ্ধিকালে তাঁরা কৃষ্ণপীঠ অবলম্বন করেন। আর যাঁরা সাধনকালে ষ্ণ ও গৌর উভয়ের উপাসক, সিদ্ধিকালে তাঁরা কায়দ্বয় অবলম্বন র্বক উভয়পীঠে যুগপৎ বর্ত্তমান - এটাই শ্রীগৌর-কৃষ্ণের অচিন্ত্য ভদাভেদের পরম রহস্য।"

বস্তুতঃ শ্রীগৌর- কৃষ্ণে কোন ভেদ নেই। কৃষ্ণলীলা ও গৗরলীলায় কোন পার্থক্য নেই। দুই লীলাই এক। কৃষ্ণ লীলায় জন বিষয় প্রতিভাত; আর গৌরাঙ্গ লীলায় সেই ভজনের প্রণালী তিভাত হয়েছে। প্রণালী ছেড়ে ভজন ও ভজন ছেড়ে কেবল ণালী কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। এই কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গের রণাশ্রয় করে যাঁরা কৃষ্ণভজন করেন, তারাই জগতে পরমধন্য।

এ ত' গেল শ্রীল ঠাকুরের গৌরজনত্বের পরিচয়। ঠাকুরের ার একটি অতিগূঢ় পরম রমণীয় স্বরূপ আছে - সেটি হল - তিনি শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা মঞ্জরী। তিনি নিত্যসিদ্ধ কমল মঞ্জরী। ইহা তাঁর রচিত কীর্ত্তনে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি শ্রীমতীর কায়ব্যূহ। শ্রীমতীর নিজজন ছাড়া কেউ শ্রীরাধা-গোবিন্দের অন্তরঙ্গা সেবা দান করতে পারেন না। তিনি নিজেই তাঁর স্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন -

"আমি ত' স্বানন্দ সুখদবাসী।
রাধিকা মাধব চরণদাসী।।

* * *

ভকতিবিনোদ শ্রীরাধাচরণে।
সঁপেছে পরাণ অতীব যতনে।।"

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর হলেন শ্রীরূপানুগাচার্য্য। এই রূপানুগ আচার্য্যগণই মঞ্জরীভাব সাধন জগৎকে শিক্ষা দিতে পারেন। কেবলমাত্র মঞ্জরীগণই এই উন্নতোজ্জ্বল প্রেমরসের অধিকারী। তিনি জগতে শ্রীরাধাসেবা শিক্ষা দেবার জন্য জগতে এসেছিলেন। তাঁর

আচরণময় জীবন চরিত আলোচনা করলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যা
যে তিনি শ্রীমতীর নিজজন।

স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ গোস্বামী তথা শ্রীরূপ মঞ্জরীর উপ
এই নিগূঢ় প্রেমরস বিতরণের সুমহান দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে
তাঁর এত ভক্তগণের মধ্যে অন্য কারও উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করে
নি। আধুনিক পৃথিবীতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রূপানুগাচার্য্যরূ
অবতীর্ণ হয়ে গৌর আচরিত ও প্রচারিত সুনির্মল, অনর্পিতচ
উন্নতোজ্জ্বল প্রেমরস জগতকে দান করলেন। স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জা
শ্রীরাধাকুণ্ডতটে তিনি তাঁর ভজনপীঠ স্থাপন করলে
'শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র ভজনোপদেশ' কীর্ত্তনের মধ্যে তিনি বারংবা
বলেছেন 'ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্'। এই কুঞ্জবিহারীর নিগূ
ভজনের কথা তিনি জগতের ভাগ্যবান্ জীবকুলকে জানালে
তিনি দ্বারকেশ কৃষ্ণের উপাসনা শিখালেন না,.মথুরেশ কৃষ্ণে
উপাসনা শিখালেন না। এমনকি ব্রজের দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য রসে
উপাস্যগণের কথাও বিশেষ কিছু বললেন না। কিন্তু তিনি পারকী
মধুর রসের বিষয়বিগ্রহ শ্রীরাধাবল্লভের কথা তথা তাঁর পরিকরগণে
কথা বিপুলভাবে কীর্ত্তন করেছেন। তাঁর রচিত 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
'জৈবধর্ম্ম', 'ভজন রহস্য,' প্রভৃতি গ্রন্থে এবং তাঁর কীর্ত্তনাবলীতে
তিনি মঞ্জরীভাব সাধনের কথা প্রচুরভাবে বর্ণন করেছেন। শ্রীধা
গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ এই মঞ্জরীভাব সাধনের মহাপীঠ।

এখন প্রশ্ন হতে পারে আমরা কলিহত ত্রিতাপক্লিষ্ট জীব। আম
কি করে এত বড় বস্তু লাভ করতে পারবো? কারণ মঞ্জরীভাব সাধ
করে এতে সিদ্ধিলাভ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। পরম কারুণি
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বড় কৃপা করে জগতে এর রহস্য জানি
দিয়ে গেলেন। তিনি জানালেন যে, শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের পদধূ
হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই মঞ্জরীভাব সাধনের একমাত্র উপায়। যা

মঞ্জরীভাব পাওয়ার জন্য ব্যাকুল, সত্যিকারে লোভযুক্ত তারা যেন রূপানুগাচার্যগণের পদধূলি হওয়ার যত্নাগ্রহ করেন। শ্রীরূপমঞ্জরীর রাতুল চরণকমলের ধূলিকণা হবার জন্য আন্তরিক লোভ বা চেষ্টা চাই। অন্যান্য ভজন প্রণালীর তুলনায় শ্রীরূপের তথা শ্রীরূপানুগ আচার্য্যগণের ভজন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য, উৎকর্ষ ও চমৎকারীতা যাঁরা উপলব্ধি করবেন - তাঁরাই কেবলমাত্র এই মঞ্জরীভাব রস সমুদ্রে অবগাহন, সন্তরণ করতে পারবেন। অন্য কারও পক্ষে এটা সম্ভব নয়। রূপানুগ গুরুবর্গের পদরজ প্রাপ্তির জন্য উৎকট লালসা যাদের চিত্তে জাগ্রত হয়েছে তারাই এই মঞ্জরীভাব সাধনের অধিকার অর্জন করবেন। একথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহুভাবে বহুস্থানে জগৎকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। তাঁর রচিত কীর্ত্তনাবলীতে মঞ্জরীভাব সাধনের অপূর্ব শিক্ষামৃত বিতরিত হয়েছে। রূপানুগ আচার্য্যবৃন্দের চরণধূলি লাভের জন্য হৃদয়োত্থিত কাতর ক্রন্দন চাই। ব্যাকুল অন্তরের সুগভীর ক্রন্দন ছাড়া কখনও এই ভজন পদ্ধতিতে প্রবেশ লাভ সম্ভব নয়। প্রতিদিন যদি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের এবং শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা লাভের জন্য নিষ্কপট সরলপ্রাণে অশ্রু বিসর্জন না হয় তাহলে বুঝতে হবে হৃদয়ে অপরাধের বজ্রলেপ আছে। এরূপ কঠিন চিত্ত ব্যক্তির জন্য রূপানুগ সাধন পদ্ধতি নয়। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ তাঁর রচিত 'শরণাগতি' গ্রন্থের প্রথম থেকেই রূপানুগ গুরুবর্গের কৃপাকণা লাভের জন্য কাতর ক্রন্দনের কথা বলেছেন.।

"রূপ-সনাতন পদে দন্তে তৃণ করি।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুহুঁ পদ ধরি।।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে, আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম'।।

* * *

" যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর।।'

* *

'ভকতিবিনোদ এই আশা করি
বসিয়া গোদ্রুম বনে।
প্রভু কৃপা লাগি ব্যাকুল অন্তরে
সদা কাঁদে সংগোপনে।।"

বস্তুতঃ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত সা
কীর্ত্তনের মধ্যেই এই দৈন্যময় করুণ ক্রন্দনের সুর বেজে উঠে
প্রভুকৃপা লাভের জন্য ভক্তচিত্তের কাতর ক্রন্দন ও করুণ আর্ত্তি
তাঁর লেখনীর মধ্যে ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এই নিষ্ক
ক্রন্দনই মঞ্জরীভাব সাধনের একমাত্র উপায়। রূপানুগ গুরুব
কৃপা ছাড়া এই সাধন কেউ করতে সক্ষম নয়। অন্য ভক্তগণের ক
দূরে থাক, চন্দ্রাবলী আদি সখীগণের পক্ষে পর্য্যন্ত যা একেব
দুষ্প্রাপ্য, সেই সুদুর্লভ প্রেমধন কেবলমাত্র রূপানুগাচার্য্যগ
অহৈতুকী কৃপায় সুলভ হয়ে যায়। আর সেই কৃপালাভ, সেই
বরণের জন্য আত্মার বিচ্ছেদগত সুতীব্র ক্রন্দনের কথা-শ্রী
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন ও তাঁর সমগ্র লীলায় প্রতি ছত্রে
দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের করুণা অন
তাঁর দিব্য অলৌকিক অসমোর্দ্ধ মহিমার এককণা প্রকাশ কর
"ব্রহ্মাণ্ডের ভূমি যদি লেখার কাগজ হয়, সপ্ত সাগরের জল
লেখার কালি হয় এবং গৌরীশৃঙ্গ পাহাড় যদি লেখার কলম হয়
তাঁর অমন্দোদয় দয়াসিন্ধুর একবিন্দুও বর্ণন বা প্রকাশ করা
না"--একথা আর এক রূপানুগাচার্য্য শ্রীল আচার্য্যদেব জানিয়েছে

তিনি বলেছেন-

"ভক্তিবিনোদ দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগতে যা দান করে গেছেন, যা পরবর্ত্তীকালের জন্য রেখে গেছেন - তাঁর এক অংশ এমনকি একটি অক্ষরও যদি কেউ পালন করার নিষ্কপট যত্ন অধ্যবসায় করে তবে তাঁর জীবন ধন্য হয়ে যাবে, তাঁর জীবন আলোকিত হবে এবং অমিত চিৎশক্তি লাভ করে দ্রুত গোলোকের রহঃ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে সমর্থ হবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে মঞ্জরীভাব সাধন জগতে প্রকাশ করলেন তা কলিহত-মায়াক্লিষ্ট-সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ তাড়িত জীব কিভাবে সাধন করবে সেই প্রণালী সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন। সাধক জীব কি ভাবে সুগোপ্য রাজ্যের সন্ধান পাবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে দিয়েছেন। সেই নির্ভুল অভ্রান্ত নিত্য সত্য শাশ্বত সনাতন পথ ধরে যদি কেউ কোনদিন চলতে চেষ্টা করে তবে নিশ্চিত সেই ব্যক্তি করুণার পথ ধরে আলোয়-আলোকিত রাজপথে যেতে পারবে। এটা আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। সাধকগণ যাতে এক জন্মে ধীরে ধীরে ক্রমপন্থায় উন্নত সোপানে আরোহণ করতে পারে সেজন্য তিনি বহুবার ক্রমধরে ভজন করার কথা বলেছেন। সাধক জীব ক্রমধরে ভজন না করলে পতন অবশ্যম্ভাবী।

"অতি সাবধানে ভাই অসৎসঙ্গ ত্যজ।
নিরন্তর পরানন্দে হরিনাম ভজ।।
সাবধানে ক্রমধর যদি সিদ্ধি চাও।
সাধুর চরিত দেখি শুদ্ধ বুদ্ধি পাও।।"

এ ছাড়াও সাধক কিভাবে সাধন জীবনকে পরিপুষ্ট করে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব ভূমিকায় নিয়ে যাবে তা অতি সুন্দর করে তিনি শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, ভজন রহস্য, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত,

জৈবধর্ম্ম গ্রন্থে অসংখ্যবার কীর্ত্তন করেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনো ঠাকুর নামতত্ত্ববিদ্- নামাচার্য্য -নামপ্রেমিক এবং নামাকৃষ্টরসঙ্গ যেভাবে সাধক অনর্থ অপরাধ কাটিয়ে শুদ্ধহরিনাম গ্রহণ করা তারও সুস্পষ্ট নির্দেশ করেছেন। শুদ্ধনাম না হওয়া পর্যন্ত সাধ বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না।

"অনর্থ নাশের যত্ন কভু নাহি যার।
নাম কৃপা নাহি পায় দুর্দ্দৈব তাহার।।
নাম কৃপা বিনা কোটি কোটি যত্ন করে ।
তাহাতে অনর্থ কভু নাহি ছাড়ে তারে।।
নিষ্কপটে যত্নে কাঁদে নামের চরণে।
দূর হয় অনর্থ তাহার অল্পদিনে।।
অনর্থ ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
একান্ত ভাবেতে লও নামের শরণ।।"

শ্রীনামের শ্রীচরণে শরণ ও আত্মসমর্পণের জন্য যদি নিষ্ক যত্ন, অধ্যবসায় ও আর্ত্তি না থাকে তবে লক্ষ লক্ষ হরিনাম কা বিশেষ সুবিধা হবে না বরং অনবধানরূপ নবম নামাপরাধ হবে। ত নামাপরাধ শূণ্য হয়ে শুদ্ধনাম করার জন্য বলেছেন-

" নামাভাস ভেদি শুদ্ধনাম লভিবারে।
সদ্গুরু সেবিবে জীব যত্ন সহকারে।।
ভজনে অনর্থ নাশ যেইক্ষণে পায় ।
চিৎস্বরূপ নাম নাচে ভক্তের জিহ্বায়।।
নাম সে অমৃতধারা নাহি ছাড়ে আর।
নামরসে মত্ত জীব নাচে অনিবার।।
নাম নাচে জীব নাচে নাচে প্রেমধন।
জগৎ নাচায় মায়া করে পলায়ন।।"

* * *

"সাধুসঙ্গে স্বল্পকাল ছাড়িয়া বিষয়।
নির্জনে লইলে নাম এই দোষ ক্ষয়।।"
ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণনামে চিত্ত হয় স্থির।
নিরন্তর নাম রসে হয় ত' অধীর।।
তুলসীর সন্নিকটে কৃষ্ণলীলা স্থানে।
সাধু-সন্নিধানে বসি সাত্বত বিধানে।।
ক্রমে কালবৃদ্ধি করি সেই নামস্মরে।
অতি শীঘ্র বিষয়ের ছন্দ হইতে তরে।।" (হঃচিঃ)

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীহরিনাম চিন্তামণিতে সাধকগণকে এইভাবে নাম করার উপদেশ করেছেন,-প্রথমে অত্যল্প কাল নির্জনে একাগ্র হইয়া নাম করিবে। ক্রমে নাম সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে নামানুশীলনের নৈরন্তর্য্য এবং বিষয় প্রতিবন্ধকের ক্ষয় অবশ্য হইবে। "অন্তর্মুখ ভক্ত মহাশয় প্রথমে দশ অপরাধ ত্যাগ পূর্বক কেবল নাম স্মরণ ও কীর্ত্তনের নৈরন্তর্য্য সাধন করিবেন। স্পষ্ট স্পষ্ট নাম উচ্চারণ পূর্বক স্মরণ কীর্ত্তন করিবেন। নাম স্পষ্ট ও সুখকর হইলে শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপ ধ্যান করিবেন। হস্তে মালা সংখ্যা, মনে বা মুখে কৃষ্ণ নামানুসন্ধান করিতে করিতে নামার্থ যেরূপ তাহা চিন্নয়নে দর্শন করিতে থাকিবেন। অথবা শ্রীমূর্ত্তীর সম্মুখে বসিয়া রূপ দর্শন ও নাম স্মরণাদি করিবেন। নামের সহিত রূপ একত্ব প্রাপ্ত হইলে ও কৃষ্ণগুণ সকল স্মরণে আনিতে অভ্যাস করিবেন। নাম, রূপ ও গুণ একত্র অভ্যস্ত হইলে প্রথমে মন্ত্র ধ্যানময়ী লীলার স্মরণ করিয়া তাহার নাম-রূপ-গুণের সহিত ঐক্য করিয়া লইবেন। স্বারসিকী অষ্টকাল লীলা ধ্যান করিতে করিতে সম্পূর্ণ রসোদয় হইবে। এই সাধনের আরম্ভকালে সাধক প্রায় কনিষ্ঠ ভাব প্রাপ্ত। অনতিবিলম্বেই সাধক উত্তম সাধুসঙ্গে মধ্যম ভক্ত হইয়া অবশেষে উত্তম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন। কনিষ্ঠাবস্থায় কিছুদিন নামাভ্যাস

হয়। নামাভ্যাসে অনর্থ দূর হইলেই শুদ্ধ নামাধিকার ও বৈষ্ণ
সেবাধিকার হয়।

যে সকল সাধক বাহ্যাড়ম্বরে ব্যস্ত বা অন্তর স্থির করিতে য
করেন না, তাদের স্মরণ আপন যোগ্য হয় না। সুতরাং বহুজ
সাধনেও সিদ্ধি হয় না। এই ভজনই সহজ ভজন কিন্তু ইহাে
কোন প্রকার উপাধি খল উপস্থিত হইলে সাধনান্তর হইয়া পড়ে
ব্রজসাধন হয় না। শ্রীগুরুদেবের নিকট সরল অন্তঃকরণে এ
ভজনের শুদ্ধতা ও উপাধি বুঝিয়া লইয়া ভজন করিবেন।

সাধকগণ হরিনাম গ্রহণকালে চিত্ত স্থির করার দিকে যত্ন ন
করলে - বহুযুগ হরিনাম করেও অনর্থমুক্ত হতে পারবে না। কেব
মালা টানাই সার হয়। অনিপুণ লোকের পক্ষে বহুযুগ চলে যাে
কিন্তু সাধকগণ সচেতন হয়ে সতর্কতার সঙ্গে নিরপরাধে চিত্তস্থি
করে নিরন্তর নাম গ্রহণ করলে অল্পদিনেই নাম তাঁর চিৎস্বরূপ প্রকা
করেন। অবশেষে নিজপাদপদ্ম দান করেন। সাধকগণ যাে
সতর্কতার সঙ্গে নাম করতে পারে তার জন্য বলেছেন-

"নিজসিদ্ধ একাদশভাবে ব্রতী হয়ে।
স্মরিবে সুদৃঢ় চিত্তে নিজ ভাব চয়ে।।
স্মরণে বিচার এক আছে ত' সুন্দর।
আপনের যোগ্যস্মৃতি কর নিরন্তর।।
আপনের অযোগ্য স্মরণ যদি হয়।
বহুযুগ সাধিলেও সিদ্ধি কভু নয়।।
আপন সাধনে স্মৃতি যবে হয়ে ব্রতী।
অচিরে আপনদশা হয় শুদ্ধ অঁতি।।
নিজ শুদ্ধভাবের যে নিরন্তর স্মৃতি।
তাহে দূর হয় শীঘ্র জড়বদ্ধমতি।।" (হ: চি:)

শুদ্ধভক্তিলাভেচ্ছু সাধকগণ এইভাবে ক্রম প্রণালীতে ভজন

করতে থাকবেন। অবশেষে সাধনভক্তি পরিপুষ্টতা লাভ করে ভাবভক্তিতে আরোহণ করেন। তখন তিনি স্মরণ, ধ্যান, ধারণা, ধ্রুবানুস্মৃতি অতিক্রম করে অবশেষে প্রেমরূপ সমাধি লাভ করেন। কিভাবে স্মরণ করতে হয় তা শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানিয়েছেন।

স্মরণ অবস্থায় প্রথমে কেবল স্মরণ অর্থাৎ নিজের একাদশ ভাবে অবস্থিতি পূর্বক অষ্টকাল সেবা-ভাবনা। তখনও নৈরন্তর্য্য সিদ্ধি হয় নাই। কখনও কখনও স্মরণ হয়, কখন বিক্ষেপ। স্মরণ করিতে করিতে ধারণা অর্থাৎ-স্মরণের স্থৈর্য্যভাব-সাধনই ধারণা। ধ্যাত বিষয়ের সর্বাঙ্গ ভাবনা করিতে করিতে ধ্যান হয়। অবশেষে অনুস্মৃতি ও সমাধি প্রাপ্ত হয়। স্মরণে পঞ্চদশা অতিক্রম করিতে অনিপুণ লোকের পক্ষে বহুযুগ যাইতে পারে কিন্তু নিপুণব্যক্তির পক্ষে অল্প দিনেই আপনদশা উপস্থিত হয়। নিপুণ অর্থাৎ চিত্তস্থির ও নিরন্তর নাম গ্রহণ। অতএব যিনি নাম সাধনে ফললাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাহার তিনটি বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, সুনির্জন এবং নিজের সুদৃঢ়ভাব বা পরাকাষ্ঠা ইহাকে নির্বন্ধ বলা যায়। (হরিনাম চিন্তামণি)

শ্রীল ঠাকুরের বদ্ধজীবগণের প্রতি অশেষ কৃপা। তিনি ক্রমধরে ভজন করার কথা বললেন। ক্রমহীন সাধকের পতন অবশ্যম্ভাবী। ক্রমধরে নামভজন করলে অন্য সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষা অতি সহজে এবং স্বল্পকালে সিদ্ধিলাভ করবে। এতে নৈপুণ্যমাত্র - কু-সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করে সাধুসঙ্গে নিরন্তর শুদ্ধ নামানুশীলন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'ভজন রহস্যে' বলেছেন, --

"ভক্তিমূলা সুকৃতি হইতে শ্রদ্ধোদয়।
শ্রদ্ধা হইলে সাধুসঙ্গ অনায়াসে হয়।
সাধুসঙ্গে ফলে হয় ভজনের শিক্ষা।
ভজন শিক্ষার সঙ্গে নামমন্ত্র দীক্ষা ।।

ভজিতে ভজিতে হয় অনর্থের ক্ষয়।
অনর্থ খর্বিত হইলে নিষ্ঠার উদয়।।
নিষ্ঠা নামে যত হয় অনর্থ বিনাশ।
নামে তত রুচি ক্রমে হইবে প্রকাশ।।
রুচিযুক্ত নামেতে অনর্থ যত যায়।
ততই আসক্তি নামে ভক্তজন পায়।।
নামাসক্তি ক্রমে সর্বানর্থ দূর হয়।
তবে ভবোদয় হয় এইত নিশ্চয়।।
ইতিমধ্যে অসৎসঙ্গে প্রতিষ্ঠা জন্মিয়া।
কুটিনাটি দ্বারে দেয় নিম্নে ফেলাইয়া।।
অতি সাবধানে ভাই অসৎসঙ্গ ত্যজ।
নিরন্তর পরানন্দে হরিনাম ভজ।।" (ঐ)

অধিকার লাভ না করে যদি শ্রীরূপানুগ ভজন পদ্ধতি অনুকর করতে যাই তবে জীব প্রাকৃত সহজিয়া হয়ে যাবে । তাতে আত্ম অনন্ত পতন তাই ঠাকুর ক্রমধরে ভজন করার জন্য বারংবার ঘোষ করেছেন---

"পরম পাবন কৃষ্ণ তাঁহার চরণ।
নিষ্কপট শ্রদ্ধা সহ করহ ভজন।।
যাঁর নাম সূর্যাভাস অন্তরে প্রবেশি।
ধ্বংস করে মহাপাপ অন্ধকার রাশি।।
এই শিক্ষাষ্টকে কহে কৃষ্ণলীলা ক্রম।
ইহাতে ভজনক্রমে লীলার উদ্গাম্।
প্রথমে প্রথম শ্লোক ভজ কিছুদিন।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে তবে হওত প্রবীণ।
চারি শ্লোকে ক্রমশঃ ভজন পক্ক কর।
পঞ্চম শ্লোকেতে নিজ সিদ্ধদেহ বর।।

ঐ শ্লোকে সিদ্ধদেহে রাধা পদাশ্রয়।
আরম্ভ করিয়া ক্রমে উন্নতি উদয়।।
ছয় শ্লোক ভজিতে অনর্থ দূরে গেল।
তবে জান সিদ্ধদেহে অধিকার হইল।
অধিকার না লভিয়া সিদ্ধদেহ ভাবে ।
বিপর্যয় বুদ্ধি জন্মে শক্তির অভাবে।।
সাবধানে ক্রমধর যদি সিদ্ধি চাও।
সাধুর চরিত দেখি শুদ্ধ বুদ্ধি পাও।।
সিদ্ধদেহ পেয়ে ক্রমে ভজন করিলে ।
অষ্টকাল সেবাসুখ অনায়াসে মিলে।।
শিক্ষাষ্টক চিন্ত, কর স্মরণ কীৰ্ত্তন।
ক্রমে অষ্টকাল সেবা হবে উদ্দীপন।।
সকল অনর্থ যাবে পাবে প্রেমধন।
চতুর্বর্গ ফল্গুপ্রায় হবে অদর্শন।।" (ঐ)
"ভক্তিযোগে সর্বসিদ্ধি যদি ধরে ক্রম।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বাস্তব ভজন প্রণালীতে সাধন করলে জীব অনায়াসে এক জন্মে শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করতে পারবে। এতে কোন রকম সন্দেহ নেই। ক্রমধরে ভজন করলে অতি শীঘ্র প্রেমফল প্রাপ্তি হয়। তা না হলে ক্রম বিহীন পথে দুষ্ট ফল অর্জন হয়।

"নাহি চড়ি বৃক্ষোপরি টানাটানি ফলধরি
দুষ্টফল করিলে অর্জন।"

শুদ্ধভক্তি পথের যাত্রীই হতে পারবে না প্রেম লাভ ত' বহু দূরের কথা। সেইজন্য আমরা যাতে নিষ্কপটে কেঁদে কেঁদে শ্রীনাম গ্রহণ করতে পারি তজ্জন্য অকপটে নিরন্তর শ্রীনামপ্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাতে হবে এবং ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁর কৃপা প্রপ্তির জন্য

অবস্থান করতে হবে। গোপনে গোপনে প্রভুর চরণে নিষ্কপট ও ক্রন্দন পূর্বক বিজ্ঞপ্তি জানাতে হবে।

"প্রভু কৃপা লাগি ব্যাকুল অন্তরে
সদা কাঁদে সঙ্গোপনে।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম থেকে আমরা যে বহুমূল্য রত্নস্বরূপ শ্রীহরি প্রাপ্ত হয়েছি তা নিরপরাধে গ্রহণ করতে হবে। শ্রীল ভক্তিবি ঠাকুর জানিয়েছেন আমরা যদি শ্রীহরিনাম আদর ও প্রীতি সহযে না করি তবে আমাদের হরিনাম গ্রহণ কেবল কাছিটানাতে পর্যব হবে এবং কিছু অপরাধ সঞ্চয় করে শ্রীহরিনাম থেকে বহুদূরে যেতে হবে। যে কৃষ্ণনাম একবার গ্রহণ করলে সুবিমল প্রেম হয় সেই নাম শত শত বার গ্রহণ করেও আমাদের চিত্ত বিগলিত হয়ে আরও কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হল,

"রুচি যায় অন্য স্থানে নামে উদাসীন।
নামে চিত্ত লগ্ন নহে জপে প্রতিদিন।।
চিত্ত একদিকে আর অন্য দিকে নাম।
তাহার মঙ্গল কিসে হয় গুণধাম।।
লক্ষনাম পূর্ণ হইল সংখ্যা মালা গণি।
হৃদয়ে নহিল রস বিন্দু গুণমণি।।" (ভঃর)

আমরা কেবল সংখ্যামালা পূরণের দিকে যত্ন করি এবং তজ্জ ব্যস্ত হই। কোনরূপে নামের সংখ্যা পূরণ করেই নিশ্চিন্ত থাকি। কি করুণাময় যে নাম গ্রহণ করলে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ও প্রেম উপস্থি হয় সেই প্রেম প্রদানকারী প্রেমনিধির নাম গ্রহণ করেও আমাদের চি কোন পরিবর্ত্তন হয় না। হৃদয় বিগলিত হয় না । অথবা বিগলি হল কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখারও সময় আমাদের নেই বা প্রয়োজ মনে করি না। এমনি আমাদের দুরবস্থা । এমনই আমাদের শ্রী ভজনের ছলনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের এরূপ অপূর্ব সুযোগের সদ্ব্যব

ান করতে পারি, তাঁর একান্ত আশ্রয়ে ও আনুগত্যে থেকে
গালবিহারীর সেবায় সাহায্য করতে পারি তজ্জন্য আমাদেরকে এই
ন্মে এখনই উঠে পড়ে লাগতে হবে। আমরা যাতে অপরাধ সম্বন্ধে
চেতন হয়ে নিরন্তর নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্মে কেঁদে কেঁদে তাঁদের
হৈতুকী স্বৈরিণী কৃপা প্রার্থনা করতে পারি তজ্জন্য যত্ন বিশিষ্ট হব।
ই অভাব বোধ বা কান্না না আসা পর্যন্ত্য তাঁদের কৃপা অবতরণ
রবে না।

"নিজ নিজ ভাগ্যফলে জীব পায় ভক্তি।
ভক্তি লভিবারে নাহি সকলের শক্তি।।"

শ্রীরূপানুগাচার্য্যগণের পৃথিবীতে অবতরণের একটি কাজ তা
ল-বিপ্রলম্ভ নাম প্রেম দান। সেই প্রেম পেতে হলে শ্রীল
ক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরণরেণু পাবার জন্য কাঙ্গাল হতে হবে।
ারণ মাথুর বিরহকাতর ব্রজবাসিগণের মধ্যে সেই নিত্যসিদ্ধ
প্রলম্ভ নাম ভজন দৃষ্ট হয়। এটাই তাঁদের সত্ত্বা। এটাই তাঁদের জীবন
ভূষণ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র ভজন জীবনে মাথুর
রহের সুস্পষ্ট ধ্বনি ব্যক্ত হয়েছে। আর আমাদের যদি সেই প্রেম
ম পেতে হয় তবে আমাদেরকে তাঁদের পরিপূর্ণ আনুগত্যে সুতীব্র
রহে ভজন করতে হবে । বিরহের মধ্যে মহামিলনের মহাসেতু
চিত হয়। যে ভাবে ডাকলে গোলোকবিহারী লীলাময় হরি এ প্রপঞ্চ
থকে আমার ডাক শুনতে পাবেন, যে ভাবে ডাকলে তিনি সাড়া না
য়ে থাকতে পারবেন না - সেইভাবে প্রভুকে আহ্বান করতে হবে।
বেই তিনি শুনতে পাবেন। সেই ডাক বিরহের ডাক-সেই ডাকই
থুর বিরহ-সেই ডাকই বিপ্রলম্ভ নাম। এই বিপ্রলম্ভ নাম ভজন
ক্ষা দেওয়ার জন্যই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রপঞ্চে অবতরণ।
ীলঠাকুর শ্রীমতীর নিজজন। তাঁর মহিমা অসংখ্য ও অগণিত। তাঁর
করুণার কণা বর্ণন করাও মাদৃশ বদ্ধ জীবকীটের পক্ষে বাতুলতা

শুধু তাই নয় পরন্তু ধৃষ্টতা। তবুও তাঁর কৃপা কণা প্রার্থনা মুখে তাঁ রূপানুগভজনতন্ত্রের ও অলৌকিক ভজনাদর্শের কয়েকটি দিগ্‌দর্শন করা ক্ষুদ্র চেষ্টা করছি। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রদ্ধা হতে প্রেমোদয় পর্যন্ত্য যে ক্রম প্রদর্শন করেছেন সেই ক্র প্রণালীর সঙ্গে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টককে গ্রথিত করে নামভজনে মাধ্যমে অষ্টকালীয় ভজনের রহস্য উদ্‌ঘাটন শ্রীল ভক্তিবিনো ঠাকুরের রূপানুগ ভজনের একটি মহাবৈশিষ্ট্য। ইহা শ্রীভজন রহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শ্রীল ঠাকুর 'শ্রীরূপানুগ ভজন দর্পণ' নামে যে গীতিগুচ্ছ রচনা করেছেন তাতে তিনি শ্রীরূপানুগ ভজনটি যে কী জিনিষ তা বলেছেন

"বহুজন্ম ভাগ্যবশে, চিন্ময় মধুর রসে,
স্পৃহা জন্মে জীবের হিয়ায়।
সেই স্পৃহা লোভ হঞা, ব্রজধামে জীব লঞা,
রূপানুগ ভজনে মাতায়।।
ভজন প্রকার যত, সকলের সার মত,
শিখাইল শ্রীরূপ গোসাঞি।"

আর শ্রীলরূপ গোস্বামীর শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বলেছেন-

"ছাড়ি অন্য অভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম সহবাস,
আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন।
শুদ্ধ ভক্তি বলি তারে, ভক্তিশাস্ত্র সুবিচারে,
শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত বচন।।
শ্রবণ,কীর্ত্তন, স্মৃতি, সেবার্চ্চন, দাস্য, নতি,
সখ্য-আত্মনিবেদন হয়।।
সাধন ভক্তির অঙ্গ, সাধকের যাহে রঙ্গ,
সদা সাধুজন-সঙ্গময়।।

সাধন ভক্তির বলে, ভাবরূপা ভক্তি ফলে,
তাহা পুনঃ প্রেমরূপ পায়।
প্রেমে জীব কৃষ্ণ ভজে, কৃষ্ণভক্তি রসে মজে,
সেই রস শ্রীরূপ শিখায়।।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীরূপের 'উপদেশামৃতের' পীযুষবর্ষিণী বৃত্তিতে শ্রীরূপানুগ ভজনের প্রতিকূল ও অনুকূল বিষয় সমূহের বিচার দেখিয়েছেন-তা নবীন সাধকগণের পক্ষে পরম কল্যাণপ্রদ। কারণ অধিকাংশ সাধক রূপানুগ ভজনের অনুকূল ও প্রতিকূল বুঝতে পারে না। তারা অনুকূলটাকে প্রতিকূল ভাবে আবার প্রতিকূলটাকে অনুকূল বলে গ্রহণ করে। সেজন্য শ্রীল ঠাকুরের এই ব্রজ ভজনের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার এটা জীবের প্রতি মহা করুণার অবদান। ইহাও তাঁর রূপানুগ ভজন বৈশিষ্ট্য। ষড়বেগের দাস হয়ে বাইরে ভাবুকতা ও রসিকতার ছলনা যে রূপানুগ ভজন নয়, তা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উপদেশামৃতের পদ্যানুবাদে পীযুষবর্ষিণী বৃত্তিতে তথা শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় উপদেশামৃতের কথিত ভক্তির প্রতিকূল ও অনুকূল দ্বাদশটি বিষয় অবলম্বন পূর্বক দ্বাদশটি প্রবন্ধ রচনা করে দেখিয়েছেন। 'পীযুষবর্ষিণী বৃত্তি'র উপসংহারে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীরূপানুগ ভজনের রহস্য অধিকারী ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য স্বল্পাক্ষরে লিখেছেন।

"শ্রীরাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজন পরায়ণদিগের বাসযোগ্য স্থান। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করে শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয়গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসীভাবে অবস্থিতি করত বাহ্যে নিরন্তর শ্রীনামাশ্রয় পূর্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজন চাতুরী।"

শ্রীরূপানুগ ভজনের আর একটি বৈশিষ্ট্য রূপানুগবর ঠাকুর

ভক্তিবিনোদ জগতে প্রকাশ করেছেন। আত্মসম্ভোগ বা ত্যাগমূলক ভজন রূপানুগ ভজন নয়। কৃষ্ণের বিচ্ছেদ জন্য আত্মার স্বাভাবিক আর্ত্তিই শ্রীরূপানুগ ভজন।

"শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসী ভাবে অবস্থিতি করত বাহ্যে নিরন্তর শ্রীনামাশ্রয় পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্যা করাই' যে শ্রীরূপানুগ ভজন রহস্য বলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানিয়েছেন, সেই রহস্যের মধ্যে আর একটি রহস্য এই যে, শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর গৌর ব্রজবনে ভেদ দর্শন না করে নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী স্বরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডাভিন্ন শ্রীগোদ্রুমের স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জে শ্রীরাধা-মাধবের যে নিত্য কীর্ত্তন করেছেন - তাই তাঁর অপ্রাকৃতসাহিত্য ও কীর্ত্তনাকারে প্রকাশিত। সেই অপ্রাকৃত সাহিত্য-রসামৃত সিন্ধুর একটি বিন্দু আস্বাদন করার যোগ্যতা হলে জীব কৃতকৃতার্থ হতে পারেন।"

শ্রীগৌরসুন্দর যে ভক্তিবিনোদ ধারা প্রবাহিত করেছেন, সেই ধারায় যারা অবগাহন করতে চান তাদের হৃদয়ে অন্যাভিলাষ বা কোন প্রকার কপটতার স্থান নাই। তাদের চিত্ত বৃত্তিতে কেবল শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর সেবাযুক্ত লালসাময়ী আর্ত্তি বিরাজিতা। এই শ্রীভক্তিবিনোদ ধারায় সম্ভোগের কোন কথা নেই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমন্দোদয়া-দয়ার এক কণাও আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবকীট স্পর্শ করলে ধন্যাতিধন্য হবে। তাঁর কৃপা অনন্ত অপার তাঁর দয়া অসীম । শুধু একটা কথা বলতে পারি-

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
ভক্তিবিনোদপাদাব্জরেণুঃ স্যাং জন্ম জন্মনি।।"

তাঁর রচিত গ্রন্থ অসংখ্য। সমস্ত গোস্বামী গ্রন্থের টীকা, ভাষ্য, কবিতা সরল প্রাঞ্জল ভাষায় রচনা করেছেন। তাঁর সংস্কৃত রচনার গ্রন্থ মৌলিক বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। তিনি শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা, শিক্ষাষ্টকের

সম্মোদন-ভাষ্য, দশোপনিষদচূর্ণিকা, আম্নায়সূত্র, তত্ত্ব বিবেক, গৌরাঙ্গ-স্মরণমঙ্গলস্তোত্র, স্ব-নিয়ম দশকম্, দশমূল নির্য্যাস, শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম, দত্তকৌস্তুভ, শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, শরণাগতি, গীতাবলী, কল্যাণ কল্পতরু, ভজন রহস্য, গীতার রসিক রঞ্জন টীকা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য, চৈতন্য উপনিষদ্ ভাষ্য, উপদেশামৃতের ভাষ্য, *Life and Precepts of Sri Chaitanya, The Bhagabat* ইত্যাদি বহুগ্রন্থ রচনা করে সাধক জীবের চরম কল্যাণ করেছেন।

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌরশক্তি স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে।।"

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটিত শ্রীভক্তিবিনোদ ধারায় পরবর্ত্তী রূপানুগাচার্য্য-অবধূত চূড়ামণি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ ভজন চরিত শ্রবণ করার প্রয়াস করছি। শ্রীরূপানুগা-চার্য্যবর্গের দিব্যোন্মাদময় বিপ্রলম্ভ ভজন চরিত আলোচনা ও দর্শন করাই আমাদের গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য!

অবধূত চূড়ামণি শ্রীলগৌরকিশোর

পরমগুরুদেব অবধূত চূড়ামণি, পরমহংস চূড়ামণি, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবশিরোমণি শ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ অন্তরঙ্গ নিজজন হলেন- ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ। শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ নিত্যধামবাসী। তিনি গৌরজন-কৃষ্ণজন। সুতীব্র বিরহে তিনি কখনও ব্রজধামে কখনও গৌরধামে ভজন করেছেন। প্রভুর সেবার জন্য

প্রয়োজনানুসারে তিনি কখনও ব্রজধামে আবার কখনও গৌরধা
বিচরণ করেছেন। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের ধার
গৌড়ীয় মিশন পরিচালিত। শ্রীধাম প্রভুর নিত্য সন্তোষ-বিধানক
গৌড়ীয় মিশনের ধারায় এরূপ মহাজনের আবির্ভাব হয়েছে। অ
বিশেষ ভাগ্যের ফলে জীবনে গৌড়ীয়গণের দর্শন মিলে। তাঁ
শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ, তাঁদের সঙ্গে আলাপন, তাঁদের মনোহভী
সেবা বহুজন্মের সঞ্চিত ভাগ্যের ফলে লাভ হয়। শ্রীল গৌরকিশো
দাস বাবাজী মহারাজ ছিলেন বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ। তিনি বৈরা
অর্থাৎ কৃষ্ণানুরাগী। অনুরাগী অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমে অনুরাগী, কৃষ্ণসেব
অনুরাগী। শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজীর বৈরাগ্যের কথা শুন
ভগবৎ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর কথা স্মরণ হ
তাঁর কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্যের আদর্শ নিতান্ত পাষাণ হৃদয়কে
দ্রবীভূত করে । শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রী
রঘুনাথের বৈরাগ্যকে 'পাষাণের রেখা' বলেছেন। শ্রীল গৌর কিশো
দাস বাবাজীর বৈরাগ্য ঋণাত্মক নয় পরন্তু ধনাত্মক নিত্যসি
ব্যাপার। তাঁর বৈরাগ্য বিপ্রলম্ভ প্রেমজাতীয়। শ্রীকৃষ্ণসুখসেবাবাঞ্ছা
ময়ী চিদ্‌বিলাসের সহায় বিপ্রলম্ভ ব্যাপার। এই বৈরাগ্য ব্যাপার
শুদ্ধ ভক্তিযুক্ত চিদ্‌বিলাস সাহিত্য। এটি মায়াবাদীর অচিদ্‌বিলা
নয়। এই বৈরাগ্য তাঁর নিত্যসিদ্ধ স্বরূপে বিরাজিত।

'নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম রক্ষণ না যায়'--এ বাণীটি প্রকৃ
প্রস্তাবে তাঁর অতিমর্ত্ত্য অলৌকিক জীবন চরিত্রে পরিস্ফুট হতে দে
যায়। পূর্ণমাত্রায় তাঁর আচরণে পরিদৃষ্ট হত বলে শ্রীল ভক্তিবিনো
ঠাকুর অনেক সময় শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অসামান্য বৈরাগ্যোদ্দী
জীবন, শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান ও শ্রীগৌর-কৃষ্ণানুরাগের কথা আলোচ
করেছেন। তিনি কারও সঙ্গ করতেন না। তিনি নিত্যকাল প্রভুপাদে
সঙ্গ করেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করেন। সম্পূর্ণভাবে পৃথক ও সকল স

ৰ্জ্জিত হয়ে একাকী শুদ্ধ ভজনে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন-
স্ব-জাতীয় যাঁরা তাঁদের সঙ্গে থেকে যদি নরকেও যেতে হয় তাও
াঞ্ছনীয় তবু বিজাতীয়ের সঙ্গে স্বর্গে বা বৈকুণ্ঠেও যেতে চাই না।
তিনি এই পার্থিব জগতে শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্বোত্তম আদর্শ ও
কৃষ্ণপ্রেমার যে বিপ্রলম্ভ মূর্ত্তি প্রকাশ করেছেন তাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মের
নিত্য অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যরাশি বিস্তার করছে। তিনি নিরন্তর
শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর উদ্দেশ্যে অত্যন্ত দৈন্য জ্ঞাপন পূর্বক কাতর কণ্ঠে
গান করতেন -"কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে। দেখা দিয়ে প্রাণ
রাখো রাধে রাধে।। তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে।"

পরমকারুণিক শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজ
জীবের নিত্য বাস্তব মঙ্গল বিধানের জন্য বহু মূল্যবান্ উপদেশ ও
শিক্ষা প্রদান করেছেন। তিনি ছিলেন ভাগবতধর্মের নীরাগ
বক্তা-নিজে যথার্থ সত্যের আচরণ করে অপরের কাছে তা প্রচার
করতেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ ছিলেন প্রকৃত ধামবাসী। নিষ্কিঞ্চন
মহাজন এই ধামের মহিমা সম্পর্কে বহু কথা বলে গেছেন। আমরা
যারা নবদ্বীপ ধামে বাস করতে চাই, তাদের বিশেষভাবে বাবাজী
মহারাজের শিক্ষামৃত স্মরণ করা উচিৎ। শ্রীনবদ্বীপ ধাম সাক্ষাৎ
শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহ--শ্রীগৌরহরির চিন্ময় লীলাভূমি। এখানে শুধু
নিষ্কপটভাবে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা করার উদ্দেশ্য নিয়ে থাকতে
হবে। মহাজনের অনুসরণ না করে অনুকরণ করলে আমাদের
কোনদিন মঙ্গল লাভ হবে না। অবধূতকুলচূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোর
প্রভুর অতিমর্ত্ত্য চরিত্র হতে জানা যায় যে, যারা মহাভাগবতের সেবার
ছলনা করে তাদের পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ। প্রকৃত সাধুর উপদেশ
শ্রবণ না করে ধর্মধ্বজিগণের সঙ্গ ও কপটতা করে বৈষ্ণব সাজা ও
ত্যাগী পোষাক গ্রহণ করলেও মঙ্গল লাভ করতে পারে না। পরন্তু
ভয়াবহ অকল্যাণ লাভ করে থাকে। শ্রীল বাবাজী মহারাজের সঙ্গে

যারা কোন না কোনভাবে কপটতা করেছে - তাদেরই নানাপ্র
বিষয়াসক্তি যোষিৎ সঙ্গে রতি ও অপরাধ ফলে অধঃপতন হয়ে
নামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ ফলে সময় সময় সর্বনাশ হয়। শ্রীধ
ভোগবুদ্ধির সঙ্গে বাস করাটা শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু অধিক
নিন্দা করেছেন। কারণ শ্রীধামের মাহাত্ম্যবলে অধিকতর ভোগপ্র
জাগবে। শ্রীনামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধের ফলে সাধকের সর্ব
হয়। নবদ্বীপের কুলিয়াতে একটি ছইয়ের মধ্যে তিনি বাস করছে
এঁর এমন বৈরাগ্য যে, তা দেখে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়।
হচ্ছে রূপানুগ ভজন পদ্ধতি। আমরা মুখে 'রূপানুগ' বলি ,
কোটি কোটি জন্মেও রূপানুগ হতে পারব কিনা ঠিক নেই। রূপা
ভজন পদ্ধতি এঁরা জগতে দেখাচ্ছেন- ছইয়ের মধ্যে অনাড়ম্বর জী
যাপন। Plain living and high thinking এর আদ
সর্বোচ্চ প্রেমরাজ্যে, বিপ্রলম্ভ ভজনের চরম সীমায় উপনীত হয়ে
এঁরা। এঁদের সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা
বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। এঁরা অপ্রাকৃত ভাবের এমন উচ্চ
শিখরে বিচরণ করছেন যে, এঁদের কোনরকম নাগাল পাওয়া
এঁদের বিষয়ে কিছু বলা বা কিছু অনুভব করা আমার মত জীবাত্ম
পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এঁরা বৈরাগ্যের চরম সীমায় উপনীত হয়েছে
বৈরাগ্য কেন? নিরন্তর শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিরহানলে দগ্ধ হওয়
জন্য এ জগতের সমস্ত কিছু ভুলে গেছেন। খাওয়া, থাকা, বিশ্রাম
সব ভুলে গেছেন। এ জগতের কোথাও কোন কিছুতে আসক্তি
গন্ধমাত্রও নেই। এঁদের ভিতরে শুধু বিরহের আগুন দাউ দাউ ক
জ্বলছে। তাই পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর মধ্যে দে
যায় অসাধারণ বৈরাগ্যের আদর্শ। তাঁর এসব অত্যদ্ভুত দিব্যোন্মাদ
লীলার কণিকামাত্র অনুভব করা বা উপলব্ধি করা দুষ্কর ব্যাপা
অসম্ভব ব্যাপার। তিনি যেসব উপদেশ দান করেছেন, সেই

পদেশ এত উচ্চতম শিখরে অবস্থিত যে, সে গুলি আচরণ করার গ্রহণ করার বিন্দুমাত্র শক্তি আমার নেই। তাঁর সমস্ত বাণীই ীবন্ত। তাঁরা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিরহে আত্মহারা। বিরহতেই তাঁদের সবা হয়। প্রপঞ্চে বিরহানলে উদ্দীপিত হয়ে তাঁরা যে অষ্টকালীয় সবা করছেন তা কল্পনা করা যায় না। এটাই তাঁদের মহামহা সম্পদ।

শ্রীলগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ রঞ্জিত দিব্য জীবন অলৌকিক মহিমায় ভাস্বর। একবার তিনি পায়খানায় বসে শ্রীহরিনাম করতে লাগলেন। একথা শুনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন, বাবাজী মহারাজ ঠিকই করেছেন। তিনি যেখানে বসে হরিনাম করুন, সেটাই শ্রীরাধাকুণ্ড। তিনি নিরন্তর হরিনাম করতেন আর হরিনামের সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের অষ্টকালীয় প্রেমসেবা করতেন। সেই সেবাতে তিনি নিরন্তর সমাধিস্থ থাকতেন। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ তাঁর মহাসম্পদ জগতে প্রকাশ করেছেন, যার ফলে আমরা তাঁর পরবর্ত্তী যুগে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে পাচ্ছি। তাঁর শিক্ষাধারাকে বিপুলভাবে প্রচার করার জন্য, সেই রূপানুগ ভজন পদ্ধতি জগতকে দান করার জন্য তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। রূপানুগ ভজনে শুদ্ধ নাম ভজনেরই উৎকর্ষ, শুদ্ধনাম সেবারই প্রাধান্য, নাম প্রভুর অষ্টকালীয় সেবারই প্রাধান্য। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মের করুণা যদি কোন দিন পাওয়া যায়, তাহলে ভক্তিসিদ্ধান্ত কিছু কিছু বুঝা যাবে। শুধু এঁদের সিদ্ধান্ত বুঝা নয়, নিজের জীবনকে সেভাবে গঠন, সংশোধন, পালন সর্বোপরি নিজের জীবনে আচরণ করা চাই। শ্রীল আচার্য্যদেব খুব সুন্দর করে বলেছেন যে, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ যে লীলা জগতে প্রকট করেছেন, সেই লীলাতে আমাদের প্রবেশ লাভ করতে হলে আমাদের কোটি কোটি জন্ম সেই আদর্শের জন্য জীবনকে বলি দিতে হবে।

সেই ভজনাদর্শ জীবনে রূপায়িত করার জন্য যারা কোটি কোটি জ
আত্মবলি দানের দৃঢ় সকল্প গ্রহণ করেছে, তারা হয়ত কোন জ
শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর মহিমা এক-আধটুকু বুঝতে পারবে। আম
এই মহাজনকে কি চিনব? এঁর মহিমা কী বা বলব? আমাদের ম
অনর্থগ্রস্থ, অপরাধী ব্যক্তির পক্ষে এ সম্বন্ধে কোন ধারণাই করা য
না। রূপানুগ গুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি লাভের জন্য যদি আম
কোটি কোটি জন্ম সেবোন্মুখ চিত্তে অপেক্ষা করি, তাহলে হয়ত কে
সময়ে তাঁদের নখকমলের দ্যুতি আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পেতে পারে
সেজন্য এঁদের সেবা খুব নিষ্কপট চিত্তে, সুতীব্র আর্ত্তি ও ব্যাকুলত
নিয়ে করতে হবে। শ্রীগুরুবর্গের পাদপদ্মে রতি-প্রীতি লাভ করা
জন্য যদি আমাদের অন্তরে আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা থাকে তাহলে
কোন না কোনদিন তাঁদের কৃপা পেতে পারব। শ্রীগুরুবর্গের বিরহ
আমাদের ভজনের মূল। শ্রীগুরুবর্গের জন্য যদি বিরহ না থাকে
তাহলে মোটেই আমরা ভজন পথে অগ্রসর হতে পারব না। তাঁদে
সুতীব্র বিরহে যত আমরা দগ্ধীভূত হবো- 'পাষাণে কুটিব মাথ
অনলে পশিব'- এরূপ ভাবে দিবারাত্র তাঁদের বিচ্ছেদ বেদনা অনুভূ
হবে তখনই আমরা তাঁদের করুণা লাভ করতে পারবো। শ্রী
গৌরকিশোর বাবাজী মহারাজ তিনি নিত্যসিদ্ধ শ্রীমতীর অন্তরঙ্গ
কিঙ্করী হয়েও শ্রীমতীর বিরহে কিরূপ-কি অপরিসীম-কি অনি
র্বচনীয় বিরহ ব্যথায় দিন কাটিয়েছেন তা সহজে বোঝা যায়। শ্রী
রঘুনাথ দাস গোস্বামীর উদ্দেশ্যে এই কীর্ত্তন গাইতেন। সর্বক্ষণ বিরহ
ব্যথায় হৃদয় নিঙড়ানো ভালবাসা ঢেলে এই কীর্ত্তনটি গাইতেন-

"কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে।
রাধে রাধে গো, জয় রাধে রাধে।।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো রাধে রাধে।
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে।

রাধে বৃন্দাবন বিলাসিনী রাধে রাধে।
রাধে কানু-মনোমোহিনী রাধে রাধে।।
রাধে অষ্টসখীর শিরোমণি রাধে রাধে।
রাধে বৃষভানুনন্দিনী রাধে রাধে।।
গোসাঞি নিয়ম করে সদা ডাকে রাধে রাধে।
(গোসাঞি) একবার ডাকে কেশীঘাটে,
আবার ডাকে বংশীবটে রাধে রাধে।
(গোসাঞি) একবার ডাকে নিধুবনে,
আবার ডাকে কুঞ্জবনে রাধে রাধে।।
(গোসাঞি) একবার ডাকে কুসুম বনে,
আবার ডাকে গোবর্ধনে রাধে রাধে।।
(গোসাঞি) একবার ডাকে তালবনে,
আবার ডাকে তমালবনে রাধে রাধে।
(গোসাঞি) মলিন বসন দিয়ে গায়,
ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি যায় রাধে রাধে।।
(গোসাঞি) মুখে রাধা রাধা বলে,
ভাসে নয়নের জলে রাধে রাধে।
বৃন্দাবনে কুলিকুলি কেঁদে বেড়ায় রাধা বলি রাধে রাধে।।
ছাপান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে, জানে না রাধাগোবিন্দ বিনে
রাধে রাধে।
চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাগোবিন্দ দেখে
রাধে রাধে।।"

এরূপ বিরহী-প্রেমিক-রসিক মহাজন পৃথিবীর মহাসম্পদ-ধরিত্রীর মহাভূষণ। ইনি প্রথম জীবনে বৃন্দাবনে পাবন সরোবরে থাকতেন। সেখানে সুদীর্ঘ কুড়ি বছর ভজন রসে নিমগ্ন ছিলেন। সেই সময়ে তিনি শ্রীজীর মন্দিরে নিত্য ফুলের মালা গেঁথে দিয়ে

পাঠাতেন। যেদিন হয়ত বহুলোকে মালা দিত সেদিন শ্রী
গৌরকিশোর প্রভুবরের মালা পরানো হত না। এরূপ একদি
শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী পূজারীকে নির্দ্দেশ দিলেন, পাবন সরোবরে
তীরে ভজনকারী যে সিদ্ধ মহাত্মা মালা পাঠান সেই মালাই আ
পরবো। সেই মালাই আমাকে নিত্য পরাবে। ইনি সাক্ষাৎ শ্রীমতী
সেবিকা ছিলেন বা শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা দাসী ছিলেন। এরূপ প্রে
বিভাবিত হৃদয়ের প্রেম ফুলে গাঁথা মালা- ভালবাসার রঙ্গে রঞ্জি
মালা শ্রীমতী পছন্দ করেন। যাঁর হৃদয়ে যত শ্রীগুরুপাদপদ্মের
ইষ্টদেবের বিরহ জাগবে তাঁর ততই শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন শী
হবে। বিরহেই দর্শন হয়, বিরহেতে প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়, বিরহের মধ
দিয়ে তাঁদের আবির্ভাব হয়। বিরহ জ্বালা যদি অন্তরে থাকে, তবে
মঙ্গল অনিবার্য।

পরমকরুণাময় জীবদুঃখেদুঃখী শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজ
মহারাজ - আমাদের মতো কোমল শ্রদ্ধালু জীবের জন্য নানা লীলা
মাধ্যমে নানা উপদেশ প্রদান করে-আমাদের প্রভূত মঙ্গল বিধান
করেছেন। আমরা মায়াবদ্ধ জীব - ভগবৎ সুখানুসন্ধান আমরা জানি
না অথচ নিজের সুখটা ভাল করে বুঝি। যার ফলে আমরা হরি সম্বন্ধী
বস্তুকে প্রাকৃত জ্ঞান করে অনন্তকালের জন্য নরকে চলে যাই। সেই
রূপ অপরাধের হস্ত থেকে উদ্ধার লাভের জন্য শ্রীল গৌরকিশোর
প্রভুর উপদেশাবলী সর্বক্ষণ হৃদিপটে গেঁথে জীবনে আচরণ করতে
হবে। তিনি বলেন- "যার সত্য সত্য প্রেম হয়, তিনি কারও নিকট
তা প্রকাশ করেন না। তিনি তা খুব গোপনে লুকিয়ে রাখেন। সতী
স্ত্রীগণ যেমন কাউকে অকস্মাৎ তাঁর অঙ্গ দেখাতে অত্যন্ত লজ্জিতা
হন এবং বাইরে সর্বক্ষণ স্বীয় দেহকে অতিশয় গোপনভাবে আবরণ
যুক্ত রাখেন তদ্রূপ প্রকৃত প্রেমিক ভক্তও ভক্তির লক্ষণ অপরের
নিকট প্রকাশ করতে অত্যন্ত লজ্জিত হন এবং বিশেষ গোপনে

সংরক্ষণ করেন। হরি ভজনে যার অকপট রতি মতি হয়েছে, বিরক্তি তাকে আশ্রয় করার জন্য অবসর খোঁজে। আমরা লোককে ভাব দেখাব না। আমরা এরূপ আচরণ করব যাতে অন্তরে হরিভজনের অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। হরিতে অকৃত্রিম আন্তরিক অনুরাগ না থাকলে বাহ্যে শত শত অনাসক্তির ভাব দেখালেও কৃষ্ণ তাকে কৃপা করেন না। আরও দূরে সরে যান। অকপট অনুরাগের গন্ধও যার নেই, বিষয়ানুরাগে হৃদয় পূর্ণ সেই ব্যক্তিই বিবিধ বাহ্য বেশভূষা ধারণ করে আর কৃষ্ণও তাকে তত অধিক বঞ্চনা করতে থাকেন। আর অপ্রাকৃত হরিতে অকৃত্রিম অনুরাগ থাকলে তাঁর অঙ্গে যদি বাহ্য দর্শনে কুষ্ঠব্যাধিও থাকে, তথাপি কৃষ্ণ তাঁর অপ্রাকৃত সেবাময় অঙ্গগন্ধে বিমোহিত হন।"

"আমরা যদি উপবাস করে দিবারাত্র হরিনাম করতে পারি, আর লোককে না দেখিয়ে অন্তরের আর্ত্তির সঙ্গে বৃষভানুনন্দিনীর সেবা লাভের জন্য সর্বক্ষণ কাঁদতে পারি। তা হলে শ্রীরাধার প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণ আপনা হতেই পাকড়াও হয়ে যাবেন।"

"যার হরিভজনের ইচ্ছা আছে, সে যেন অসৎসঙ্গ না করে। অসৎসঙ্গ রাখব, সৎসঙ্গের অভিনয়ও করব কিংবা গোপনে গোপনে ধর্মধ্বজিগণের দুঃসঙ্গ করব। যারা এরূপ বিচার পোষণ করে, তাদের অনর্থ আরও বেড়ে যায়। বহু কষ্ট সহ্য করে নিরন্তর সৎসঙ্গে থেকে শ্রবণ-কীর্ত্তন করলে তবে হরিনামের সেবা রক্ষা করা যায়। অকৃত্রিম সাধুর শ্রীচরণে চিরতরে অহৈতুকী ভাবে আত্মসমর্পণ না করলে প্রকৃত সাধুসঙ্গ হয় না। প্রকৃত সাধুর শ্রীপাদপদ্মে সর্বস্বসমর্পণ পূর্বক প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা প্রবৃত্তির সঙ্গে অনুক্ষণ সাধুর আদর্শের অনুগমনই সাধুসঙ্গ। সঙ্গ অর্থে সম্যক্ গমন। সাধুসঙ্গের অভিনয় সাধু সঙ্গ নয়। সাধু সঙ্গের ফল ফলার পূর্বেই সাধুসঙ্গ ত্যাগ করলে সেই ফল হতে বঞ্চিত হতে হয়।"

একবার কোনও ব্যক্তি হরিকথা শ্রবণ বন্ধ করে দিলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাকে বললেন- "আপনি হরিকথা শ্রবণ পরিত্যাগ করে এখন কি নির্জন ভজন আরম্ভ করেছেন? হরিকথা শ্রবণের সময় সাধুসঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গ হলে মায়া ভজনের বিঘ্ন ঘটাতে পারে না। নির্জন ভজনের চেষ্টায় যদি শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন বা সাধুসঙ্গের অভাব থাকে, তাহলে নির্জন ভজন প্রয়াসীকে মায়া আরও অধিক আক্রমণ করবে। তখন হরিচিন্তার পরিবর্ত্তে বিষয় চিন্তা এসে হৃদয়কে অধিকার করবে।" একথা শুনে ঐ ব্যক্তি বললেন - আমি মনে করেছি সাধুর কাছে এসে হৃদয়ে ব্যথা পাওয়া অপেক্ষা নির্জন ভজনই ভাল। তদুত্তরে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বললেন- "দেখুন, যে সাধু তীব্র সত্য কথা বলে মায়া পিশাচীকে তাড়িয়ে দেয়, সেই প্রকৃত সাধু ও পরম বান্ধব। লোকে স্ত্রীর কটুবাক্য বা আত্মীয় স্বজনের গালি শুনে প্রাণান্তেও তাদেরকে ছাড়তে চায় না, বরং তাদেরকে প্রসন্ন করে তাদের সেবাতেই নিবিষ্ট হয়। আর শুভানুধ্যায়ী সাধু যদি একটি শাসন বাক্য বলেন তৎক্ষণাৎ তাঁকে জন্মের মতো পরিত্যাগ করার সংকল্প করে। আপনি যদি প্রকৃত ভজন করতে চান তাহলে বৈষ্ণবগণের গালিকে মায়া ত্যাগের মন্ত্রৌষধের মত গ্রহণ করবেন। তা'হলেই শ্রীহরিনাম গ্রহণ করার অধিকার লাভ করতে পারবেন।"

"আজকাল পণ্ডিতেরা 'আনুকূল্য' শব্দের অর্থ টাকা, সুন্দরী ও মিষ্টিকথা এই সকল বুঝেছেন। আমি ত' একমাত্র ভজনের আনুকূল্য দেখছি- চাল ভিজিয়ে খেয়ে ছইয়ে বাস করে শ্রীহরিনাম করা। এমন খাওয়া খেতে হবে যা কুকুরে খায় না। এমন পরা পরতে হবে যা চোরেও নিতে ঘৃণা বোধ করে। আর সর্বক্ষণ যথার্থ শুদ্ধভক্ত সঙ্গে থেকে শ্রীহরিনাম করা। কিন্তু বানরগুলির মত বৈরাগী হলে ভজন চুলোয় যাবে। বানরগুলি গাছের ডালায় চুপ করে বসে থাকে, একটু সুযোগ পেলেই অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করে। বানরের মত মর্কট বৈরাগী

করে কখনও শ্রীহরিভজনে নিষ্ঠা লাভ করতে পারা যায় না। সাধুসঙ্গে নামই রূপ, গুণ, লীলারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। যাদের নামে বিশ্বাস নেই সেই সকল দুর্ভাগা লোক পৃথকভাবে অষ্টকালীয় লীলা শিক্ষা করার দুর্বুদ্ধি পোষণ করে নিজের অমঙ্গল বরণ করে থাকে।"

"আপনাদিগকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যা দিয়েছেন, ঐ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নামের অক্ষরগুলো ও শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের নামের অক্ষরগুলো ১৬নাম ৩২ অক্ষর আর যেই মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আপনাদিগকে দিয়েছেন, ঐ নামমন্ত্রের অক্ষরের দিকে নয়ন দিয়ে নিরন্তর নাম ও মন্ত্র জপ করবেন। মায়ার ব্রহ্মাণ্ডের দিকে নয়ন যেন না যায়। শ্রীনামের অক্ষরগুলোর এত শক্তি আছে যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ও শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের সহিত দর্শন পাবেন ও সেবা পাবেন। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের দাস-দাসীর সহিত দর্শন ও সেবা পাবেন। সুতরাং পৃথক্‌ভাবে অষ্টকালীয় সেবা স্মরণের কোন প্রয়োজন নাই। সর্বতোভাবে কায়-মনো-বাক্যে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করে নিরপরাধে শুদ্ধনাম ভজনই একমাত্র ভজন। একদিন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু এক সেবককে ডেকে বললেন, - আজ বড় গোসাঞির তিরোভাব তিথি, উৎসবের আয়োজন কর। তখন সেবক লোকজন নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে চাইলে তিনি বললেন,- লোকজন নিমন্ত্রণের প্রয়োজন নেই, একবেলা আহার বন্ধ করে উপবাস করে নিরন্তর নাম গ্রহণই উৎসব পালন। নিরন্তর নামানুশীলন ব্যতীত ভগবৎ সেবা লাভ হয় না। নামের মধ্যেই ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর ও সেবা সমস্তই আছে।"

জগদ্‌গুরু শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় বিগ্রহ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি শ্রীগুণ মঞ্জরী। তাঁর কৃপা আকর্ষণের মধ্যে পড়তে পারলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার অবশ্যম্ভাবী। এই অবধূতপ্রবরের অপ্রাকৃত লীলা শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিরন্তর

সুখোৎপাদক। এইসব মহাজনগণের পদধূলি লাভের জন্য আকু
ক্রন্দন পূর্বক নিরন্তর নাম করলে তাঁদের প্রসন্নতায় এই রূপানু
ভজনে প্রবেশ লাভ হয়।

ওগো চিরসুন্দর ওগো চিরসুন্দর
ওগো প্রভু চিরসুন্দর।

গোলোকের মহাদূত অবনীতে আবির্ভূত
মহাগুরু গৌরকিশোর।।

বিপ্রলম্ভ প্রেমরাশি ত্রিভুবনে পরকাশি
বিতরিলে পতিত পামরে।

হেন তব লীলা শোভা ভক্তগণ মনলোভা
ভাসে সবে প্রেমের সাগরে।।

বৃষভানুসুতাপ্রিয়া সেবা দেখি মত্ত হিয়া
প্রীতিভরে পরে ফুলমালা।

নিশিদিন কান্দ তুমি 'হা বৃষভানুনন্দিনী'
সর্ব অঙ্গে মাখো ব্রজধূলা।।

বরষাণা ধূলিতলে ডাকো 'রাধে রাধে' বলে
প্রেমলোর বহে দু'নয়ানে।

বিরহ বিধুর হিয়া নিদ্রাহার তেয়াগিয়া
মত্ত নামরস সুধা পানে।।

তুমি গুণমঞ্জরী তোমার চরণ বরি
গাহি তব গুণ আঁখি নীরে।

করুণার লেশ মাগি ভারতী আছে গো জাগি
রাধাকুণ্ড-কুঞ্জ-কুটীরে।।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আচার্য্যকেশরী

শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

"নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে।।
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধ বিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ।।
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তি বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে।।
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে।।"

শুদ্ধভক্তি গঙ্গার ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৃহে এই আচার্য্য কেশরীর আবির্ভাব। ইনি বিপ্রলম্ভপীঠ ক্ষেত্রধামে আবির্ভূত হন। যেখানে শ্রীগৌরসুন্দর দিব্যোন্মাদে বিভূষিত হয়ে স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দ সঙ্গে ১৮ বৎসরকাল বিপ্রলম্ভ রস আস্বাদনে বিভোর ছিলেন। শ্রীক্ষেত্রধামের সর্বত্র মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ প্রেমের সাক্ষীরূপে অদ্যাপীহ বিদ্যমান। শ্রীগৌরসুন্দর মায়াপুরে অবতীর্ণ হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক ক্ষেত্রধামে দিব্যোন্মাদে রসাস্বাদন করলেন। তাঁর সেই রসাস্বাদন ক্ষেত্র হতে শ্রীল প্রভুপাদ আবির্ভূত হয়ে মায়াপুরে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক শ্রীরূপশিক্ষা বিতরণ করলেন। পরস্পরের এটা মহাভাবের বিনিময়—মহাপ্রেমের বিনিময়। উভয়ের এই লীলা-বৈচিত্র্য আমাদের চিত্তকে বিস্ময় সাগরে নিমজ্জিত করে। শ্রীকৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে অর্থাৎ 'পঞ্চম পুরুষার্থ' দানের জন্য তিনি রাগানুগাপঞ্চাঙ্গের মূর্ত্তিধারণকরে জগতে অবতরণ করেছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ প্রেমে শ্রীক্ষেত্রধামের প্রতিটি অনু- পরমা
বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, নর-নারী সকলেই অভিষিক্ত। সেই প্রেম
ক্ষেত্র হতে শ্রীল প্রভুপাদ প্রকটিত হলেন বিপ্রলম্ভ ধারাকে প্রবল
ভাবে পুষ্ট করার জন্য। জগতের জীব মহাপ্রভুর অবদান অনর্পিত
উন্নতোজ্জ্বল প্রেমের কথা ভুলে গিয়ে আবার সম্ভোগবাদে পরিপ্
মত্ত হয়ে গিয়েছিল, সেইজন্য শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় শ্রীলপ্রভুপা
অবতীর্ণ হলেন- জগতকে প্রবলভাবে এই বিপ্রলম্ভ প্রেম দান করতে
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল প্রভু পাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে
বলেছেন- শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু দৈব বর্ণাশ্রম এবং শুদ্ধ বৈষ্ণ
সমাজ সংস্থাপন পূর্বক বৈষ্ণব জগতে শুদ্ধনাম প্রচারের জন
পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন। এই দুই কার্য্যে তিনি শ্রীগৌরসুন্দরে
ভার প্রাপ্ত।" (সরস্বতী জয়শ্রী)"

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজ বলতেন, শ্রীল প্রভুপা
সাক্ষাৎ শ্রীগৌরসুন্দর। সাক্ষাৎ গৌরসুন্দর না হলে এরক
নাম-সংকীর্ত্তনের বন্যায় বিশ্বকে প্লাবিত করতে পারতেন না
আজকের দিনে আমরা যে মঠ-মন্দিরে বাস করে শ্রীবিগ্রহ সেবা ও
নামসংকীর্ত্তন এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনের অপূর্ব সুযোগ লাভ করেছি -
তা শ্রীল প্রভুপাদের অপার অতুলনীয় কৃপার পরিচয়। আমরা সকলেই
শ্রীল প্রভুপাদের বংশধর। সমগ্র গৌড়ীয় সম্প্রদায় শ্রীল প্রভুপাদের
শ্রীচরণে নিত্যকাল ঋণী। শ্রীগৌর মনোঽভীষ্ট স্থাপনের জন্য
পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন তিনি। মনোধর্ম্মী সহজিয়া
সম্প্রদায়গণ যখন শ্রীরূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্তকে আবৃত করে ইন্দ্রিয়
তর্পণকে ভক্তি, অপস্বার্থপরতাকে- উদারতা, লোকবঞ্চনাকে-ধর্ম
বলে প্রচার করছে তখনই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব।
তিনি তাঁর নিত্য পরিকর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে সঙ্গে
এনেছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আচার ও প্রচার

ভক্তিসিদ্ধান্তময় ছিল। তাঁর নাম ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী, তাঁর রূপ ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী-শ্রীরূপের ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী, তাঁর গুণ-ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী, তাঁর লীলা-ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী প্রচার লীলা, তাঁর পরিকর বৈশিষ্ট্য সবই ভক্তিসিদ্ধান্ত। অপ্রাকৃত ভক্তিসিদ্ধান্তই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর। এটাই তাঁর নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ। শ্রীরূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপনই আম্নায় ধারার আচার্য্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আমরা যদি ভক্তিসিদ্ধান্তে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হতে না পারি তবে শ্রীল প্রভুপাদকে জানা যাবে না বা তাঁর পরিকরকে চেনা যাবে না। এঁরা ভক্তিসিদ্ধান্ত দ্বারা পরিবৃত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহু ভক্তিগ্রন্থ রচনা করলেন কিন্তু প্রচারের ভার পড়ল শ্রীল প্রভুপাদের উপর। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণী প্রচারের জন্যই তাঁর পৃথিবীতে আগমন। তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে জীবকে তিনটি বস্তু দান করলেন। তা তাঁর প্রণাম মন্ত্রে পাই। শ্রীল প্রভুপাদের দানের তুলনা নেই। তাঁর দান, তাঁর করুণা, তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁর মৌলিকত্ব শ্রীরূপের দানকে ছাড়িয়ে গেছে। পূর্ব পূর্বাচার্য্যগণের বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্বকে ক্রোড়ীভূত করে শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচরী দানের পশরা উন্মুক্ত করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের দানের বৈশিষ্ট্য অভূতপূর্ব ও অদ্বিতীয়। তিনি সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তিনটি বস্তুই দান করেছেন। শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ, শ্রীরূপের পদধূলিই অভিধেয় এবং শ্রীরাধাদাস্যই প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন। আরও, সর্বক্ষণ আশ্রয় বিগ্রহের পূর্ণ আনুগত্যে শ্রীরূপের পদধূলিই আমাদের একমাত্র সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন। এই রূপানুগ ভক্তি দান করার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব। তাঁর এই অবদানের বৈশিষ্ট্য অনন্ত, একবিন্দু আস্বাদন ফলে আমরা তাঁর চরণকমলের সেবা লাভ করে ধন্যাতিধন্য হতে পারব। প্রত্যেক আচার্য্যের দুটো লীলাই দৃষ্ট হয়, একটি চরিতামৃত এবং দ্বিতীয়টি শিক্ষামৃত।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর রচিত 'শ্রীউপদেশামৃতের' অনুবৃত্তি ও পদ্যানুবাদ ব্যাখ্যাটি শ্রীল প্রভুপাদের অভিনব মৌলিক অবদান। শ্রীরূপ শিক্ষাকে তিনি কোটি কোটি কণ্ঠে কোটি কোটি হস্তে এবং কোটি কোটি লেখনীতে প্রকাশ করেছেন। শ্রীল রূপ শিক্ষাকে বহুলভাবে জীবের অন্তঃকরণে প্রবেশ করানোর জন্য প্রচুর পারমার্থিক পত্রিকা, গৌড়ীয়, নদীয়া প্রকাশ প্রভৃতি প্রকাশ করেছেন। তিনি রূপশিক্ষার মূল ভিত্তি স্বরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে শ্রীল রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দুটি শ্লোক আচার ও প্রচার করেছেন। দুটি শ্লোক' ই রাগানুগা ভক্তিরাজ্যের দৃঢ় স্তম্ভ তা হল-

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।"

এবং

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।"

"ফল্গু আর যুক্ত, বদ্ধ আর মুক্ত,
কভু না ভাবিহ একাকার সব।
কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব।
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই কি আর করব।।
আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ সহিত,
বিষয় সমূহ সকলি মাধব।
সে যুক্ত বৈরাগ্য, তাহাতে সৌভাগ্য,
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।।

কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠা সম্ভার,
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব।
বিষয় মুমুক্ষু, ভোগের বুভুক্ষু,
দুয়ে ত্যজ মন দুই অবৈষ্ণব।।
কৃষ্ণের সম্বন্ধ, অপ্রাকৃত স্কন্ধ,
কভু নহে তাহা জড়েতে সম্ভব।
মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।।
বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ,
কেনবা ডাকিছ নির্জন আহব।
যে ফল্গু বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হৈতে বৈষ্ণব।।"

বদ্ধ জীবের নৈসর্গিক রুচি ভোগ ও ত্যাগে। দেহ ও মনের কার্য্য কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। এর দ্বারা জীবের স্বাভাবিক ভোগ ও ত্যাগে প্রবৃত্তি হয়। দেহ কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়ে দ্রষ্টাভিমানে ভোগে ধাবিত হয় এবং মন জ্ঞান অর্জনের দ্বারা ত্যাগের পথে ছুটতে থাকে। এই দুটিই উত্তমা ভক্তির প্রতিকূল। জ্ঞান ও কর্ম দুটোই আত্মার প্রতিকূল। আত্মাবস্থা বা স্বরূপাবস্থা নিত্য অনুকূল। অধোক্ষজ-অপ্রাকৃত, অনুকূল-প্রতিকূল, ভোগ-ত্যাগ, ফল্গু-যুক্ত, দ্রষ্টা-দৃশ্য এইসব শ্রীল প্রভুপাদের বিদ্বদ্রূঢ়ি ভাষা। জীবকে জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম ও জ্ঞানরূপ বিষের ভাণ্ড থেকে উদ্ধার করে শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃত পান করানোর জন্য এসেছিলেন। সকল জীবকে স্বরূপে অর্থাৎ শ্রীরূপের পাদপদ্মের ধূলিত্ব উপলব্ধি বা জাগ্রত করিয়েছিলেন। এই সম্বন্ধ জ্ঞান বা অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্বরূপ উদ্বোধনই তাঁর প্রধান কার্য্য ছিল। এজন্য তিনি বহু পরিশ্রম করে অক্লান্ত ভাবে জীবের অশোধিত কর্ণে হরিকথা শ্রবণ করিয়ে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শ্রীল রূপ- রঘুনাথের

অসামান্য ভজনাদর্শ ও বিপ্রলম্ভ ভজন শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁকে জগতে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনাচারী বহির্ম্মুখ জীবকে সদাচারী করে কৃষ্ণোন্মুখ করতে তাঁর আচার্য্যলীলার সমগ্র সময় চলে গেল। রূপানুগ ভক্তি বিরুদ্ধরূপ ১৩টি অপসম্প্রদায়কে নাশ করতে বহু খণ্ডন-মণ্ডন করতে হয়েছে। এজন্য তিনি অনর্থ নিবৃত্তির কথা বেশী করে বলেছেন। শ্রীরূপের শিক্ষামৃত দান করার পূর্বে এ সব আবর্জনা, আগাছা পরিস্কার করতেই তাঁর সময় চলে গেল কিন্তু তাঁর অন্তর্নিহিত ইচ্ছা ছিল শ্রীরূপানুগ ভক্তিদান করার। শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, -"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। আমরা এতদিন সকলের নিকট লীলাগান কীর্ত্তন প্রকাশ করি নাই। কেন না, ইহা আমাদের অত্যন্ত গুপ্ত সম্পত্তি। ইহাই আমাদের একমাত্র সাধ্য। কিন্তু পাছে আপনারা ভুল করেন যে, অনর্থ-নিবৃত্তিই বুঝি প্রয়োজন, অর্থ-প্রবৃত্তির মধ্যে কোন দিনই প্রবেশ করিতে হইবে না, এইজন্য আমি অষ্টকালীয় লীলা কীর্ত্তন আরম্ভ করাইয়া দিয়াছি। আপনাদের এখনও সে কীর্ত্তন শুনিবার মত অবস্থা হয় নাই, ইহা আমি জানি। কিন্তু জানিয়া রাখুন, ভজনরাজ্যে আপনাদের এইরূপ একটি বাস্তব অপ্রাকৃত আদর্শ আছে, যাহার জন্য আপনাদের অনর্থ নিবৃত্তির প্রয়োজন । অনর্থ নিবৃত্তির পরে অর্থ প্রবৃত্তি অর্থাৎ চিল্লীলা-মিথুনের সেবার যে অপ্রাকৃত বাস্তব রাজ্য আছে, তাহা জানা না থাকিলে হয় ত' নির্ব্বিশেষবাদেই সকল চেষ্টা পর্যবসিত হইতে পারে।" তিনি কি সম্পদ দান করতে এসেছিলেন তা - 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের' অনুভাষ্যে ও 'শ্রীউপদেশামৃতের' অনুবৃত্তির মধ্যে ব্যক্ত।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের সর্ব্বোচ্চ অধিকার জানালেন - শ্রীরূপানুগগণের পদধূলিই আমাদের আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ।

"রাধা দাস্যে রহি ছাড়ি ভোগ অহি

প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন গৌরব।
রাধা নিত্যজন তাহা ছাড়ি মন
কেন বা নির্জ্জন ভজন কৈতব।।"

তাঁর অন্যতম অবদান বৈশিষ্ট্য হল শ্রীগুরুপূজা বা ব্যাস পূজার প্রচলন। শ্রীগুরুবর্গের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি পালন। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা যেভাবে কীর্তন করেছেন--সেভাবে ইতিপূর্বে কেউ এরূপ আশ্রয় বিগ্রহের মহিমা কীর্ত্তন করেন নি। শ্রীগুরুপাদপদ্মে তাঁর অতুলনীয় ঐকান্তিকী নিষ্ঠা দেখে বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে গেল। শ্রীগুরুপাদপদ্মে এরূপ নিষ্ঠা সাধকের থাকা প্রয়োজন। শ্রীল প্রভুপাদ একাধারে দুটো মূর্ত্তি ধারণ করে সম্বন্ধ-বিজ্ঞান দান করলেন। কি সম্বন্ধ দান করলেন? রূপানুগ প্রেমভক্তি। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপে ব্রজের শান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ভক্তি এবং অন্তরঙ্গা কিঙ্করী বা মঞ্জরী স্বরূপে রূপানুগা ভক্তি দান করলেন। শ্রীগৌরকরুণাশক্তি ছাড়া এ ভাবে সারা বিশ্বকে গৌরপ্রেম মন্ত্রে দীক্ষিত করতে কেউ পারবে না। সারা বিশ্ব আজ শ্রীচৈতন্য বাণীতে মুখরিত হচ্ছে। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ শক্তিতে সারা বিশ্ব ভ্রমণ করে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট স্থাপনে সমগ্র জীবনী শক্তি ব্যয়িত করেছেন। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশবিগ্রহ-সেবাবিগ্রহ-সেবক ভগবান্। আমাদেরকে নিত্যসিদ্ধ স্বরূপে জাগ্রত করার জন্য তিনি সমগ্র জীবনী শক্তি -চিদ্শক্তি এবং গ্যালন গ্যালন চিদ্ রক্ত ব্যয় করেছেন। শ্রীরূপানুগাচার্য্য ছাড়া এরূপ জীবদুঃখেদুঃখী, জীব মঙ্গলের জন্য এরূপ করুণা, এরূপ ঔদার্য্য অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি নিত্যানন্দ স্বরূপে জীব উদ্ধার লীলা করেছেন এবং রাধার অন্তরঙ্গা দাসী স্বরূপে প্রেম সেবা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি অজস্র ধারায় এই রূপানুগ ভজন শিক্ষা দিয়েছেন। সেকথা গৌড়ীয়তে প্রচুরভাবে কীর্ত্তিত আছে। তাঁর আশ্রিতগণ এইভাবে তাঁর মহিমামৃত গেয়েছেন-

"মঞ্জরীভাব মাধুর্য্য সর্বশ্রেষ্ঠ মহানিধি।
প্রচার- আচার দানে চ কুশলো গুণীনাং বর।।
পাল্যদাসী সুশিক্ষাদ চিত্তদোষ সুশোধক।
রাধা-কৃষ্ণ মহাপ্রেম স্ব-হৃদয় বিকাশক।।"

শ্রীল প্রভুপাদের অনন্ত শিক্ষা। আমরা তাঁর সার শিক্ষার ক
বলে এখন দিব্য ভজনচরিতামৃত লীলা আস্বাদন করব। আজক
আমরা সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের মঠ-মন্দির, প্রচারাদির কথা জ
এবং সেটারই অনুগমন করি। সকলেই একটি কথা বুঝেছেন
'গুরুগিরি' করতে পারলেই কৃষ্ণ-প্রাপ্তি করায়ত্ত। যদিও শ্রী
প্রভুপাদ বলেছিলেন, সকলকে গুরু হতে হবে। গুরু না হয়ে জ
থেকে বিদায় নিলে পুনরায় পৃথিবীতে আসতে হবে। অর্থাৎ শ্রী
প্রভুপাদ সকলকে প্রেমধনে ধনী করতে এসেছিলেন। কিন্তু আম
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন না করে বা প্রেম লাভ না করেই গুরুগিরি করি এ
অসুবিধার কথা। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবতের ১/১৪/৮
৮৭ পয়ারের অনুভাষ্যে লিখেছেন- "পাপিষ্ঠ গণের অপরাধ অত্য
প্রবল হইলেই তাহারা অহংগ্রহোপাসনা-মূলে গুরুসজ্জায় সব
কল্যাণগুণৈকাকর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন বর্জন করিয়া তত্ত্ব বিচার অনভি
মূঢ় সম্প্রদায়কে নিজের কামনা পূরণার্থ লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা সং
করিতে শিক্ষা দেয় এবং আপনাকে 'নারায়ণ' অর্থাৎ 'ঈশ্বর' ভগব
বা অবতার প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করায় এবং সাবরণ মহাপ্রভু এ
তন্মুখপদ্ম-কীর্ত্তিত অভিন্ন-কৃষ্ণ সমগ্র চিৎ ও অচিৎ জগৎসমূহে
সর্ব্বোত্তম আরাধ্য, পরমাক্ষরাকৃতি শব্দব্রহ্ম শ্রীমহামন্ত্র, - এই উ
স্বরূপকেই নিজের ন্যায় জড় প্রতিষ্ঠাকামী সামান্য মর্ত্ত্যজ্ঞানে
তদনুকরণে নিজ নিজ ক্রিমিবিড় ভস্মান্ত দেহ-গেহ দার-সম্পর্কি
জড় নাম বা শব্দের গান করাইয়া থাকে। যদিও গুরুতত্ত্ব বস্তু
কৃষ্ণেরই প্রকাশ বিশেষ, তথাপি তাঁহাকে আশ্রয় জাতীয় প্রক

বিবেচনা না করিয়া বিষয়জাতীয় রাধিকানাথ বা গুরুলব্ধ মহামন্ত্র-বিরোধী কৃত্রিম ছড়া-গায়ক বলিলে এবং 'ঈশ্বর' বলিয়া নিজের জড়দেহকে জড়প্রতিষ্ঠা কামনা মূলে কীর্ত্তন বা প্রচার করাইলে, সেই গুরুব্রুব বঞ্চকও বঞ্চিত ব্যক্তিগণ, উভয়েই মহাপাপ-ভারে নরকে প্রবেশ করে। ”

আমাদের আস্বাদনের বিষয় -শ্রীরূপানুগ আচার্য্যগণের বিপ্রলম্ভ ভজন মাধুরী। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অত্যাশ্চর্য ও অভূতপূর্ব শতকোটি নাম ভজন তাঁর আচার্য্যলীলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একমাত্র বিপ্রলম্ভ নাম ভজনের দ্বারা শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের দর্শন ও সেবা লাভ হয়। এই ভজনের দ্বারা তাঁদের সন্তোষ ও তাঁদের বিশেষ প্রীতি উৎপন্ন হয়। নিত্যলীলায় প্রেমরসানন্দে মগ্ন যুগল বিহারীকে আকর্ষণ করে আনে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদের উপর কিরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন তা শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ 'সরস্বতী জয়শ্রী' তে বলেছেন- “ শ্রীল ঠাকুর আমাদিগকে বলিতেন, দেখুন, সরস্বতী কিরূপ সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের আদর্শ দেখাইয়া একান্তমনে শ্রীমায়াপুরে দশাপরাধ শূন্য শ্রীনামের ভজন করিতেছে। আপনারা তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করুন” ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আরও বলিতেন,- “নিরপরাধে শ্রীনাম গ্রহণ না করিলে কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয় না। অপরাধের সহিত নাম গ্রহণের ফল - ধর্ম্ম, অর্থ, কাম; অথবা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামের অতৃপ্তি। সরস্বতী এই সকল কথা উপলব্ধি করিয়াছে, তাই তাহাতে অপতিতভাবে শ্রীরূপানুগ নামভজনানুশীলনের আদর্শ একান্তভাবে দেখিতে পাওয়া যায়; আপনারা সকলে তাহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া শ্রীনাম ও শ্রীধামের সেবায় নিযুক্ত হউন।” কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ সকলকেই শ্রীল ঠাকুর বলিতেন,--'প্রমদা বিষয়ে সর্বদা সাবধান থাকিবে, সকলকে কৃষ্ণদাস বা গুরুবুদ্ধি করিবে।' এতৎ প্রসঙ্গে তিনি প্রায়ই

বলিতেন,- 'সিদ্ধান্ত সরস্বতী এ বিষয়ে আদর্শ; তাঁহার চরিত্র লক্ষ্য করিবেন। তিনি অনেক সময়ে শুদ্ধনামকীর্ত্তনকারীর আদর্শরূপে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর নাম উল্লেখ করিতেন এবং আমাদিগকে আউল, বাউল প্রভৃতি তের প্রকার অপসম্প্রদায়ে নিকট হইতে দূরে থাকিয়া সর্বদা শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্গ করিতে বলিতেন।" ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ যতবার দর্শন করিয়াছি, ততবারই তাঁহার মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, "সরস্বতী প্রভুর ন্যায় শুদ্ধ বৈষ্ণব জগতে বিরল। ইনি ভবিষ্যতে বহুলোককে বৈষ্ণব করিবেন।"

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজও শ্রীল তীর্থ মহারাজকে শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক অত্যাশ্চর্য নাম ভজনের কথা বলেছেন। "আপনি সর্বদা সরস্বতী প্রভুর সঙ্গ করিবেন। তিনি আমার গুরুদেব এবং আদর্শ বৈষ্ণব। সকল প্রকার অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-আশ্রয়ে একান্তভাবে নাম সেবা করিতেছেন। তাঁহার বৈরাগ্য অতুলনীয়; তিনি শ্রীরূপ-সনাতনের ও আমার মহাপ্রভুর নিজজন। আপনি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা বৈষ্ণব-সেবা ও নাম সঙ্কীর্ত্তন করিবেন- খুব উচ্চ কীর্ত্তন করিবেন।" কখনও বা বলতেন - আমার প্রভুতে শ্রীরূপ-রঘুনাথের বৈরাগ্য প্রকট লক্ষ্য করিতেছি! তিনি সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ।

শ্রীল প্রভুপাদ মায়াপুরে ব্রজপত্তনে বসে সুতীব্রভাবে নামভজন করেছিলেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শিক্ষা - 'কীর্ত্তনীয় সদা হরি' - এই বাণীর অগ্নি মন্ত্রে তিনি চির দীক্ষিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শতকোটি নাম গ্রহণ করার পর সেই মালিকাটি শ্রীল প্রভুপাদকে দিয়েছিলেন। তিনি ঐ মালাতে শতকোটি নামযজ্ঞ করার ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁর এই ব্রত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নাম যজ্ঞের কথা স্বতঃই স্মরণ পথে উদিত হয়। শতকোটি নাম ভজনকালে তিনি একবস্ত্রে থাকতেন,

ভূমিতে শয়ন করতেন, অতি সামান্যমাত্র অন্ন ব্যঞ্জনাদি রহিত ভূমিতে ঢেলে গো-গ্রাসে গ্রহণ করতেন। তিনি নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অনুসরণে প্রত্যহ অন্ততঃ তিনলক্ষ নাম এবং মাসে এক কোটি নামগ্রহণ যজ্ঞ করতেন। দীর্ঘ ১০-১২ বছর এভাবে নিরন্তর শ্রীনাম ভজন করেছেন। এই নামভজনের ফলে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরের এবং শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর সকলেই দিব্যমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়ে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রত্যক্ষভাবে আদেশ করলেন,-"তুমি ভাবনা কর কেন? শুদ্ধভক্তি-সংস্থাপন- কার্য্য আরম্ভ কর--সর্বত্র গৌরবাণী প্রচার কর-- গৌর-ধাম, গৌর-নাম ও গৌর-কামের সেবা বিস্তার কর; **আমরা সকলেই নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি;** তোমার এই শুদ্ধ ভক্তি প্রচার কার্যে সর্ব্বক্ষণই আমাদের সাহায্য পাইবে, তোমার পশ্চাতে অসংখ্য লোকবল, অগণিত ধনবল, অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রভৃতি অপেক্ষা করিতেছে; যখন যাহা আবশ্যক হইবে, তখনই সেই সকল উপস্থিত হইয়া তোমার ভক্তি-প্রচার-সেবার দাস্যে নিযুক্ত হইবে। তুমি পূর্ণ উদ্যমে জগতের সর্বত্র শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল প্রেমধর্মের কথা প্রচারে অগ্রসর হও। কোন প্রকার জাগতিক বাধা-বিপত্তি তোমার এই কার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবে না। আমরা সর্বদাই তোমার সঙ্গে আছি।" তদবধি শ্রীল প্রভুপাদ কোটিগুণ প্রোৎসাহের লীলা প্রদর্শন করিয়া জগতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন ইহার পরই প্রভুপাদ অনুবৃত্তির অবশিষ্টাংশ সম্পন্ন এবং ভক্তিগ্রন্থ সমূহের প্রকাশ ও প্রচার কার্য্য বিপুলভাবে আরম্ভ করেন। আজ সেই শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের বন্যা সমগ্র ভারতের সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণের হৃদয়ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া পাশ্চাত্য দেশকেও প্লাবিত করিতে বসিয়াছে। এজন্যই বুঝি আজ শ্রীল প্রভুপাদ কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী অনুক্ষণ

সকলকে জানাইয়া বলিতেছেন, --

"যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।।
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ।।"

তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ পেয়ে সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরে বিপুলভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচর প্রেমধর্মের কথা প্রচার করলেন। সেজন্য তিনি তেরটি অপসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম করে বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে নির্ভীক সত্য বাণী কীর্ত্তন করতে পেরেছিলেন।

"পৃথিবী পর্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম।।"

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণ ভবিষ্যত বাণীকে শ্রীল প্রভুপাদ সত্যে পরিণত করেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য বাণীর পসরা নিয়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এই বাণী আম্নায় বাণী, এই বাণী বাস্তব সত্যের বাণী। শ্রীল আচার্য্যদেব বললেন,- "গৌরবাণীর বা সরস্বতীবাণীর সেবা করতে হবে। গৌরবাণী বা সরস্বতীবাণীর সেবাকে জীবনের ধ্রুবতারা বলে ঠিক করতে হবে। সরস্বতী বাণী ধ্বংস হয় না। এ আগুন অনন্ত কোটি কালেও নিভবে না। আম্নায় ধারায় এ বাণী নিত্যকাল প্রবাহিত হবে। তবে কখনও ক্ষীণ কখনও উজ্জ্বল হতে পারে। এ বাণী একটি সসীম ব্রহ্মাণ্ডের নয়, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি জীবের একমাত্র উপাস্য। এ বাণীর সেবা করতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে।"

শ্রীরূপানুগ আচার্য্যগণ সকলেই এই শতকোটি নামযজ্ঞ করেছেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী

এঁরা প্রত্যেকেই অনন্যভাবে নাম ভজনের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। তথাপি সকলের নাম ভজন প্রণালী আলাদা। শ্রীল প্রভুপাদও এই নাম ভজন প্রণালী দেখালেন। জীবের পক্ষে এরূপ সুতীব্র বৈরাগ্যে নাম ভজন করা দুরূহ। কিন্তু আবার শতকোটি নাম না করা পর্যন্ত্য শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ হবে না। সুতরাং নামাচার্য্য শ্রীগুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করে সকলকেই এই শতকোটি নাম ভজন করতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপা কটাক্ষে পতিত হলে এটা সম্ভব। সাধারণ ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের ভজন প্রণালী, শিক্ষাপ্রণালী ধরতে পারে না। অসাধারণ ভক্তগণের জন্য এই ভজন শিক্ষা। যাদের মহা মহা সৌভাগ্য আছে তারা এটা অনুভব করবেন। সুতীব্র বিরহ ছাড়া এই শতকোটী নাম গ্রহণ সম্ভব নয়। এটাই বিপ্রলম্ভ নাম ভজন। এটা ছাড়া ব্রজে কেউ যেতে পারবে না। একমাত্র নামময় তনু গোলোকে যেতে পারে। কারণ,

"গোলোকে বৈঠত গাওই নিরন্তর
নাম বিরহ নাহি জানে।"

শ্রীল প্রভুপাদ যে শ্রীরাধার অন্তরঙ্গ প্রিয়জন সেটা তাঁর লীলায় পরিস্ফুট হয়েছে। যদিও তাঁর মহিমা অনন্তদেব অনন্তমুখে কীর্ত্তন করে শেষ করতে পারেন না। তবুও তাঁর দাসানুদাস - ভৃত্যানুভৃত্য সূত্রে তাঁর অসমোর্দ্ধ অলৌকিক অপ্রাকৃত দিব্য গুণাবলী কীর্ত্তন করাই আমাদের নিত্যকাল একমাত্র স্বরূপের ধর্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন না করলে আমাদের শিষ্য বলে পরিচয় দেওয়ার যোগ্যতা আসে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নাম-মহিমা, রূপ-মহিমা, গুণ-মহিমা, লীলা-মহিমা আমাদের মতো হতভাগ্য জীবের একমাত্র শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয়, স্মরণীয়, বন্দনীয়, পূজনীয় ও সেবনীয়। শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ মঞ্জরী স্বরূপ আমাদের জানতে হবে। তাঁর এই রাধাজনত্বের স্বরূপ আমাদের দর্শন করতে হবে। কি ভাবে হবে? সুতীব্র বিরহে

নিরন্তর নাম ভজনের দ্বারা তাঁর মঞ্জরী স্বরূপের দর্শন হবে।

"পাল্যদাসী সুশিক্ষাদঃ চিত্তদোষ সুশোধক।
রাধাঁ-কৃষ্ণ মহাপ্রেম স্বহৃদয় বিকাশকঃ।।'

এই বিপ্রলম্ভ নাম ভজনের দ্বারা আমাদের নিজের স্বরূপও দর্শন হবে। নিজের স্বরূপ ও শ্রীল প্রভুপাদের স্বরূপ দর্শন হলে তখন গুরু-শিষ্যের মিলন হবে। সেই মিলন আত্মার মিলন। চেতনে -চেতনে মিলন। আমাদের দিক থেকে সুতীব্র ভজন পরিপাটী অপর দিকে শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপার মিলন হলে তখন তাঁর রাধাজনত্বের উপলব্ধি হবে, দর্শন হবে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর নয়নের মণি বলে তিনি নয়নমণি মঞ্জরী। তাই তিনি 'বার্যভানবীদয়িতদাস' বলে নিজেকে সর্বক্ষণ পরিচয় দিতেন।

রূপানুগ পূজ্যবরা শ্রীবার্ষভানবী হরা
তাহার দয়িত দাস -দাস।

শ্রীল আচার্য্যদেব 'সরস্বতী জয়শ্রী'তে বলেছেন,- "প্রভুপাদের যে-প্রকার অদ্ভুত ভাবাবেশ হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার মত চিত্তবৃত্তি ও যোগ্যতা আমাদের নাই। আমি শুনিয়াছি,-- শ্রীল প্রভুপাদ বৃষভানুনন্দিনীর কোন কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে অজস্র প্রেমাশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার সমূহ লক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু গাম্ভীর্য্য বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ চিরদিনই নিজ-অতিমর্ত্ত্য সাত্ত্বিক ভাবসমূহকে সংগোপন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন।" আবার কখনও কখনও হরিকথা বলতে গিয়ে যখন লীলায় প্রবেশ করে যেতেন তখন তাঁর এরূপ বিপ্রলম্ভ দশা উপস্থিত হত---

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।"

" যে ব্যক্তি আমাদের অভাবের কথা বুঝে না, আমরা অনেক

সময় দুঃখের সহিত ঠাট্টা তামাসা ক'রে ব'লে থাকি 'দয়িত'। ব্রজবাসিগণের নিকট হতে ভগবান্ যখন মথুরায় চলে গেলেন, তখন ব্রজবাসিগণ নন্দতনুজকে এই কথা বলেছিলেন। আর বল্লেন, -- 'মথুরানাথ'; 'বৃন্দাবনপতি' বল্লেন না। মাথুর গানের কথা অনেকে শুনে থাক্‌বেন; এ সকল শব্দ বিপ্রলম্ভময়ী পরিভাষা। যা'কে 'বিরহ' বলা হয়, তা'কে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে 'বিপ্রলম্ভ' বলে। ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণকে বিরহে বলছেন, -- তুমি 'দয়িত' বটে, কিন্তু তুমি 'মথুরানাথ' ; আমাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে চলে গেছ; আমরা কাঙ্গাল, তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব, সেই সর্ব্বস্ব আজ লুণ্ঠিত হ'য়েছে। সুতরাং দুঃখের কথা বলতে গিয়ে হাস্যরস ছাড়া আর কি আসতে পারে? তুমি আমাদের নয়নের মণি, আজ আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছ-- আমাদিগকে চিন্তাকুল ক'রে মথুরায় চ'লে গেছ। এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠস্বর গদগদ, বদনমণ্ডল এক অপার্থিব ভাবের রক্তিম আভায় রঞ্জিত এবং নয়নদ্বয় অদ্ভুত ভাবাবেশে বিভাবিত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাগম্ভীর প্রভুপাদ সাধারণের সভায় শীঘ্রই ভাব সঙ্কোচ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন।"

শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জীবনধরে শ্রীরূপানুগগণের বিপ্রলম্ভময়ী ভজন সম্পদের কথা কীর্ত্তন করেছেন এবং ব্রজবিজয়াভিযান কালেও শ্রীরূপের পদধূলিই আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব বলে কীর্ত্তন করে গেলেন।

" শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন।।"

* * *

" তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দনাথ ভাগ হামারা।।
নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর।
ভকতিবিনোদ চিত্ত দুঃখে বিভোর।।"

সুতরাং এই বিপ্রলম্ভ নাম ভজনের দ্বারাই শ্রীরূপের পদধূলিত্ব লাভ হয়ে থাকে এবং আমাদের শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীরাধার দাসীদেহে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিকুঞ্জ সেবা লাভ হয়। এটাই আমাদের আত্মার চরম ও পরম প্রাপ্তি। এটাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বল প্রেম দান। তিনি এই শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্ট ভুতলে স্থাপন করেছিলেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের মতো মহাগভীর ও গম্ভীর শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর। তাঁর অবদানের বৈশিষ্ট্যই আমরা অনুধাবন করতে পারছি না। তিনি কি বস্তু দিতে এসেছিলেন? তাঁর হৃদয়ের অভ্যন্তরে কি প্রেম সম্পুট লুক্কায়িত ছিল তা আমরা যদি অনুসন্ধান না করি তবে তাঁর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করতে পারবো না। তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধূলি লাভের জন্য আমাদের সমস্ত জীবনী শক্তি নিয়োগ করতে হবে। তাঁর করুণা কণা লাভের জন্য প্রবল ক্রন্দন সহকারে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলকে ধুইয়ে দিতে হবে। প্রাণকোটিসর্বস্ব বোধে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলকে বুকে জড়িয়ে ধরতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদ যে 'কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে' – এ কথাটির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। আমরা তিনবার 'কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায়' বলে গান করি কিন্তু অনুভবহীন, দর্শনহীন গান তিনি শুনেন না। বললে, শুনলে, বক্তৃতা দিলেও অনুভব হবে না। সুতীব্র ভজনের দ্বারা 'কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায়' কথাটির অনুশীলন করা চাই। এই শব্দটির অনুশীলন হলে তখন আমরা 'রূপানুগভক্তিদ' শব্দের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবো। আমরা সম্বন্ধহীন, সাধন-ভজনহীন, অনুভবহীন, ভক্তিহীন, সেবাহীন অপ্রাকৃতরাজ্যে সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য। শুধু তাঁর অহৈতুকী কৃপাকে

সম্বল করে তাঁর অসীম অনন্ত গুণরাজি স্মরণ করছি। ক্ষুদ্র টুনি পাখীর মতো আমার চেষ্টা। তাঁর অসীম, অনন্ত ও পারাবারহীন গুণরাজি অনুভব করা, কীর্ত্তন করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। শ্রীল গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কোটি কণ্ঠে কীর্ত্তন করেছেন। তিনি বলতেন, শ্রীল প্রভুপাদ সাক্ষাৎ গৌরসুন্দর। সমগ্র গৌড়ীয় সম্প্রদায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলে নিত্যকাল-অনন্তকাল ঋণী থাকবে। শ্রীল প্রভুপাদকে সুগভীরভাবে সমস্ত অন্তর উজাড় করে ভালবাসতে হবে। আমাদের অন্তরের রূপটা তাঁর কাছে খুলে দিলে, সম্পূর্ণভাবে ভালবাসলে তাঁর শ্রীচরণকমল সান্নিধ্যে নিয়ে সেবা দান করবেন— এটুকু আমি অনুভব করি।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অলৌকিক, অত্যাশ্চর্য, অত্যদ্ভুত ও অনন্ত মহিমা অনন্তকাল অনন্তমুখে কীর্ত্তন করলেও তাঁর পদনখকমলের সৌন্দর্যের এককণাও বর্ণন করতে পারবো না। সুতরাং তাঁর এ অলৌকিক মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন থেকে সুকঠিন ব্যাপার। তাঁর অত্যদ্ভুত মহিমা শিব-ব্রহ্মাদিরও অগম্য। শ্রীঅনন্তদেব অনন্তমুখে অনন্তকাল কীর্ত্তন করেও তাঁর পদনখকমলের সৌন্দর্যের এক কণাও বর্ণন করতে পারবে না। আর আমার মত অনর্থগ্রস্থ জীব তাঁর মহিমা কি বর্ণন করবে? জীব তাঁর অলৌকিক অত্যাশ্চর্য মহিমা বুঝতেই পারে না আর বর্ণন করবে কি করে? মর্ত্ত্যলোকবাসী, বৈকুণ্ঠবাসী, অযোধ্যার ভক্ত, দ্বারকার ভক্ত এমনকি মথুরার ভক্তও তাঁর অলৌকিক মহিমা বর্ণন করতে সমর্থ নয়। তাঁরা তাঁর মহিমা জানে না। জানতে পারে না, বুঝতে পারে না, হৃদয়ঙ্গম করবে কি করে? এমন কি মথুরার ভক্তগণও কোটি কোটি জন্ম তপস্যা করে বা জানবার চেষ্টা করেও জানবার সুযোগ পায় না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এরূপ মহাজনকে কোথায় বসাবেন, কাঁধে বসাবেন কি কোলে বসাবেন, কি পীঠে বসাবেন, পাশে বসাবেন, কোথায় যে রাখবেন ঠিক করতে পারছেন না। অন্যান্য দেব-দেবীগণ, বৈকুণ্ঠ, অযোধ্যা, দ্বারকা এমনকি মথুরার ভক্তগণও তাঁদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি কামনা করেন।

তাঁদের শ্রীপাদপদ্মের করুণার জন্য লালায়িত। এ সকল ভক্তের দর্শন পাওয়া দুষ্কর ও দুষ্পার। আমরা কি করে তাঁকে জানতে পারবো? মথুরার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ উদ্ধবাদিও জানতে পারছেন না। তাঁদের শ্রীচরণকমলে পূর্ণ শরণাগত ছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণকমলে পূর্ণ শরণাগত, পূর্ণ আত্মনিবেদন করলে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মকে সুদৃঢ়রূপে হৃদয়ে বরণ করলে তখন তাঁর পদনখকমলের সৌন্দর্য্য কণা উপলব্ধি হবে। আর আমরা যদি শ্রীল আচার্য্যদেবকে হৃদয়ের মণিকোঠায় প্রাণকোটিসর্বস্বরূপে বরণ করতে পারি তবে তাঁর অপ্রাকৃত পদনখমণির সৌন্দর্য্য, সৌরভ্য, সৌরস্য, সৌকুমার্য্য, সৌস্বর্য্য, ঔদার্য্য ও কারুণ্য, মাধুর্য্যাদি মহা-মহাগুণ উপলব্ধির মধ্যে আসবে।

তিনি এই রূপানুগ আম্নায় ধারায় অবতীর্ণ হয়ে জগজ্জীবের জন্য তাঁর অবদানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য রেখে গিয়েছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ– শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণি এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তে সার্বভৌম-- শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের গণেশ ও সার্বভৌম নামে অভিহিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্ব-মুখে বহুবার বলেছেন যে 'বর্ত্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবীতে শ্রীবাসুদেবের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের পণ্ডিত দ্বিতীয় আর নাই।' শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ-শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর বাণীরূপে অবতীর্ণ।

"সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।"

এই বাণীর যথার্থ মূর্ত্তবিগ্রহ রূপে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরের ভাব ও অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী সিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তন করে শ্রীরূপানুগ ভক্তিধারার মৌলিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করেছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুকম্পিত এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট পরমহংস বেষ-লব্ধ বর্ষীয়ান বৈষ্ণব শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ শ্রী শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভু সম্বন্ধে বলেছেন– " শ্রীমদ্ বাসুদেব প্রভু– নিত্যসিদ্ধ; তিনি কৃপা পূর্বক আমাদের ঘরে আসিলেও তাঁহার চরিত্রে কোন প্রকার বহির্ম্মুখতা দেখি নাই। তিনি অতি শিশুকাল হইতেই শ্রীমদ্ভাগবত, বৈষ্ণব, হরিনাম ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি বিশিষ্ট ছিলেন। অতি শিশুকাল হইতেও তিনি এক বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ব্যতীত কখনও দেবান্তর দর্শন করেন নাই। শিশুকাল হইতেই তিনি সদাচার পালন করিতেন এবং সংস্কৃত অধ্যয়নের বহু পূর্ব্বেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ শ্লোক-সমূহ অনর্গল উচ্চারণ করিতেন। অতি শিশুকালেই তিনি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গীত সমূহ মৃদঙ্গ বাদন করিতে করিতে সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন করিতেন। কেহ কোনদিন তাঁহাকে ভক্তির অনুকূল কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য করাইতে পারেন নাই। এক সময় বাসুদেব প্রভুকে লইয়া আমি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গিয়াছিলাম। তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাসুদেব প্রভুকে প্রচুর আশীর্বাদ করিয়া বলেন যে, **এই বালক ভবিষ্যতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা সমগ্র বিশ্বে প্রচার করিয়া শ্রীগুরুদেবের প্রীতিবিধান করিবেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর শিক্ষা ইহার দ্বারা অকৃত্রিমভাবে প্রচারিত হইবে।** এবং ইনি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবেন। শ্রীল প্রভুপাদও বাসুদেবপ্রভুর সম্বন্ধে আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন যে, বাসুদেবের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের পণ্ডিত জগতে নাই। একমাত্র সে-ই সম্পূর্ণভাবে আমার কথা ধরিতে পারিয়াছে। বাসুদেব প্রভু আমার পিতা, গুরু ও শিক্ষক। তাঁহা হইতেই আমার যুগপৎ

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে ভক্তি লাভ হইয়াছে। তাঁহাতে যেন আমার অন্য প্রকার বুদ্ধি না হয়, এই আশীর্বাদই আমি সকল বৈষ্ণবের নিকট ভিক্ষা করি।"(গৌড়ীয়-১৫বর্ষ, ৫০৭পৃঃ)

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর প্রাতঃকালে প্রায় তিন ঘন্টাকাল শ্রীল প্রভুপাদ পুরীর চটক পর্বতে নিজ ভজন কুটীরে বসে 'গৌড়ীয়' সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন এবং 'গৌড়ীয়' সম্পাদককে প্রচুর আশীর্বাদ করে উপদেশ দিয়েছিলেন, – " বাসুদেব আপনাদিগকে সাহায্য করিবেন। মঞ্জুষার কার্য্য এখনই আরম্ভ করা আবশ্যক। আমাদের জীবন ত' চলিয়া গেল। আপনারা এই সকল কার্য্য করিবেন, বাসুদেব দেখিয়া দিবেন। **বাসুদেবের যথেষ্ট শক্তি আছে। তিনি যখন ঐ সকল কার্য্য করেন তখন অতি সুন্দরভাবে করিতে পারেন। তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই নাই।** আমার কথাগুলি কোন জায়গায় বাদ পড়িয়া গেলে তিনি অতি সুন্দরভাবে গুছাইয়া লিখিতে পারেন; তিনি আমাদের কথা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধরিতে পারিয়াছেন। 'গৌড়ীয়', 'মঞ্জুষা', 'জয়শ্রী'–এই সকলের কার্য্য আপনি করিবেন, বাসুদেব এসব দেখিয়া দিবেন। ভক্তিবিনোদ-রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্য কিছু হউক্, উপনিষদগুলি ছাপা হউক্। গৌড়ীয়মঠ বাড়ীতে বর্ত্তমানে কেবল Commercial interest, তাই মনে করিয়াছি, দক্ষিণ কলিকাতায় একটি মঠ করিয়া বাসুদেবের উপর সেখানকার ভার দিব; সেখানে ভক্তিবিনোদ-অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগারের কার্য্য হইবে। বর্ত্তমানে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন হইতেছে না! আমার একান্ত ইচ্ছা– শ্রীরূপের সেবা হউক্।"

" পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শেষ অন্তরঙ্গ মনোঽভীষ্ট শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার এবং এই প্রচারের ভার শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং ৮ই পৌষ (১৩৪৩) বুধবার প্রাতে এবং ১৬ই পৌষ (১৩৪৩)

পূর্বাহ্নে বহু ভক্তের সম্মুখে পরম পূজনীয় শ্রীল অনন্তবাসুদে
গোস্বামী প্রভুর উপর প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বহু ভ
উপস্থিত, সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা বলিতে আরম্ভ করিয়া
-- 'বাসুদেব কই', 'বাসুদেব কই', -- এইরূপ বলিতে লাগিলেন
ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীপাদ মহানন্দ প্রভু তদানীন্তন অসুস্থলীল
অভিনয়কারী শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে ধরিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সম্মু
লইয়া আসিলেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের দক্ষি
পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত আবেগভরে শ্রী
বাসুদেব প্রভুকে বলিলেন, -- 'আপনি শ্রীরূপ রঘুনাথের কথা
প্রচার করিবেন, এই ভার আপনার উপর থাকিল।' (গৌঃ-১৬ব
৩৫১পৃঃ)

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট সংস্থাপক শ্রীরূপ-রঘুনাথ য
শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ হন, সেই রূপ-রঘুনাথের কথা প্রচা
যদি রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের একমাত্র মুখ্য কার্য্য
জগতের প্রতি শ্রেষ্ঠ করুণা হয় এবং শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও সাক্ষা
আদেশ যদি শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ মনোঽভীষ্ট সেবা হয়ে থাে
তবে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটকালের পর শ্রীল আচার্য্যদেবই একমা
শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী বিশুদ্ধভাবে কীর্ত্তন করে শ্রীভক্তিবিনো
ধারা অকৃত্রিমভাবে সংরক্ষণ করেছেন। শ্রীগোস্বামীবৃন্দ ও শ্রীরূপানু
আচার্য্যবৃন্দের দ্বারা শ্রীগৌর-মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ কার্য্য পূর্ণরূ
প্রকাশিত হয়েও অপ্রাকৃত বস্তুর অচিন্ত্য স্বভাব বশতঃ যা কি
অসম্পূর্ণ ছিল, তা শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ পরিপূরণ করেছেন। আবা
শ্রীভক্তিবিনোদ পূর্ণভাবে শ্রীগৌর-মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করে
অপ্রাকৃত সেবার স্বভাব বশতঃ পরিতৃপ্ত হতে না পারায় তাঁর
আদেশে তাঁরই মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করলেন শ্রীল প্রভুপা
পরবর্ত্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে তাঁর অন্তরঙ্গ-মনো

ভীষ্ট শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী গৌরবাণীর সঙ্কীর্ত্তন সেবাযজ্ঞে ব্রতী হলেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে আচার-প্রচারের মাধ্যমে সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের কথা নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করেছেন।

যাতে জীব রূপ-রঘুনাথের আদর্শে ভজন করতে পারে তার জন্য দিবারাত্র অনর্গলভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী কীর্ত্তন করেছিলেন। তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য কত বিনিদ্র রজনী অশ্রু বিসর্জন করেছেন। তিনি দেখালেন শ্রীরূপ-রঘুনাথের আদর্শে বিপ্রলম্ভ নাম ভজন করতে না পারলে মঠ, মন্দির, আশ্রম, ত্যাগ, বৈরাগ্য কেউ কিছু করতে পারবে না। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বৃন্দাবনে যমুনা তীরে নির্জন কুঞ্জকাননে জীবের জন্য কত অশ্রু বিসর্জন করেছেন। একটি জীবও বিপ্রলম্ভ নাম ভজন, শ্রীগৌর মহাপ্রেম লাভ করল না। তারজন্য তিনি মঠ, মন্দির তুচ্ছ করে বৃন্দাবনে চলে গেলেন। তিনি বিবাহ লীলা করেছেন কিন্তু এ লীলার অন্তরালে ছিল বিপ্রলম্ভ মহাপ্রেম আস্বাদন। জগতের লোক বাইরে দেখছে তিনি বিবাহ করেছেন কিন্তু তাঁর অশ্রুজলের ভজন কেউ দেখে নি। সকলে তাঁর বিবাহ লীলা দেখে নিন্দায় মুখর হয়ে গেল। একজনও তাঁর এই বিপ্রলম্ভ ভজনের অনুসন্ধান করে নি। শ্রীবলদেব রাস লীলা করেছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ করলেন। সেই বলদেব-নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিবাহ লীলা দেখে জগৎ নিন্দায় মুখর হয়ে গেল। কিন্তু নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রেম বিতরণ লীলার অনুসন্ধান কেউ করল না। যারা তাঁর এই বিপ্রলম্ভ ভজন অনুসরণ করবে না তাদের এ জীবনে ভজন হবে না। তিনি বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে বিপ্রলম্ভ নাম ভজন করেছিলেন। এভাবে সুতীব্র বিরহে নির্জন ভজন না করলে কেউ ভজন করতে পারবে না। তিনি নিরন্তর দিব্যোন্মাদে মত্ত হয়ে বৃন্দাবনে ভ্রমণ

করতেন। তাঁর চিত্ত ছিল কেবল 'কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।' তাঁর হৃদয় কেবল বিপ্রলম্ভ নাম রসে ভরা। এই হল শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ধারার গুরুবর্গের হৃদয়। বিপ্রলম্ভ নাম ভজন না করলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ ধারার গুরুবর্গকে ধরা যাবে না। সুতরাং তাঁদের কৃপা পেতে হলে বিপ্রলম্ভ নাম ভজন করতে হবে। শ্রীল আচার্য্যদেব কেবল 'হা গৌরাঙ্গ' বলে অশ্রু জলে বুক ভাসায়ে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে দুপুরে প্রখর রৌদ্রে 'হা রাধে! হা কৃষ্ণ!' বলে নিরন্তর কেবল মাথা কুটছেন। সেখানকার ব্রজসুন্দর বাবা এটা দেখলেন এবং তাঁর এই বিপ্রলম্ভ ভাবাবস্থা দেখে তাঁকে সান্তনা দিয়ে নিয়ে এলেন। সেই শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীল আচার্য্যদেব নিত্য সেবাতে সমাধিস্থ আছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সুগভীর বিপ্রলম্ভ নাম ভজনের গম্ভীরায় প্রবেশ করেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গম্ভীরায় যে প্রেম আস্বাদন করেছিলেন তিনি শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে সেই প্রেম আস্বাদনে ডুবে গেলেন। দিন নেই, রাত নেই, খাওয়া-দাওয়া নেই, ঘুম নেই অবিশ্রান্তভাবে এই বৈরাগ্যযুক্ ভক্তিরস পানে মত্ত হয়ে রইলেন। তিনি নিরন্তর হরিনাম-গানে মগ্ন হলেন এবং দিব্য প্রেমোন্মাদে মত্ত হয়ে বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর দিব্যোন্মাদ লীলা সুগভীর ও সুগম্ভীর। মানব বুদ্ধির অগোচর এই লীলা। কেবল সিদ্ধভক্তগণই তাঁর এই লীলা কিছু উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি কৃষ্ণ বিরহে নিরন্তর অশ্রু বিসর্জন করতেন। বিরহে কাতর হয়ে কখনো কখনো যমুনার তীরে, কখনো রাধাকুণ্ডতীরে চিন্ময় ধূলিতলে লুটোপুটি খেতেন। নিরন্তর বিরহে ছটফট করতেন। সাধারণতঃ কাউকে দেখা দিতেন না। কেবলমাত্র নামপরায়ণ ভক্তগণই তাঁর এই দিব্যলীলা আস্বাদন করতে পারেন। তিনি বলতেন—এই জন্মেই আমাদের কৃষ্ণ দর্শন করতে হবে। আমাদের আর সময় নেই। এখনই

কৃষ্ণ দর্শন করা প্রয়োজন। এরজন্য প্রতিদিন আমাদের নিষ্কপট অশ্রুজল ফেলতে হবে। শ্রীল আচার্য্যদেবের দিব্যোন্মাদ লীলা অতীব চমৎকারীতাপূর্ণ ও বিস্ময়কর। তিনি প্রায়ই যমুনার তীরে তীরে 'হা রাধে, হা কৃষ্ণ' বলে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতেন। কখনো যমুনার জলে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, কখনো গোবর্দ্ধনের গহ্বরে বসে থাকতেন, কখনো রাধাকুণ্ডে, কখনো শ্যামকুণ্ডের তীরে মাথা কুটতেন, কখনো নিকুঞ্জবনের ধূলিতলে লুটোপুটি খেতেন। কখনো বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাকে সম্বোধন করে বলতেন–"হে বৃক্ষগণ! তোমরা বৃন্দাবন বাসী, কৃপা করে আমাকে শ্রীরাধা-গোবিন্দের দর্শন করাও।" কখনো গোপীভাবে বিভাবিত হয়ে উন্মাদ হয়ে যেতেন। কখনো তিনি কৃষ্ণ বুদ্ধিতে তমালতরুকে আলিঙ্গন করতেন। কখনো ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্য দেখে মহাপ্রেমভরে নৃত্য করতে করতে ভাববিহ্বল চিত্তে শ্রীরাধা-গোবিন্দকে দর্শন করে মূর্চ্ছিত হয়ে যেতেন। কখনো শুক-শারী প্রভৃতি বন্য পাখীদের কলরব শুনে সকরুণ বিরহের সুরে কীর্ত্তন করতেন। 'হা রাধে, হা কৃষ্ণ' বলে চিৎকার করে ডাকতেন। অর্থাৎ কৃষ্ণ বিরহে উদ্‌ভ্রান্ত মন, দেহ আর বুদ্ধি দিয়ে তিনি যে অতি অদ্ভুতলীলা সমূহ করতেন, তা শুনলে পাষাণও বিগলিত হয়। কখনো বনের পশুপাখীদের ছোলা-চানা খেতে দিতেন এবং বলতেন 'তোরা ধন্য, ধন্যাতিধন্য। তোরা শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্য সহচর' এই বলে অঝোর-নয়নে কাঁদতেন। কখনো যমুনা নদীকে দর্শন করে বলতেন– "তুমি প্রেম প্রবাহিনী যমুনা, তুমি কৃপা করে যুগলবিহারীর সেবা দাও।" এমনিভাবে বিনম্র চিত্তে ব্রজের স্থাবর-জঙ্গম সকলের কাছে কৃপা প্রার্থনা করতেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের এই দিব্যোন্মাদ লীলা দর্শন করে বৃন্দাবনের নরনারী, পশুপাখী, কীটপতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, তরুলতা সকলে ক্রন্দন করতো। তিনি কখন কোথায় থাকতেন কেউ বলতে পারতেন না। তাঁর কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না।

অনিকেতন হয়ে, দেহ-গেহ স্মৃতি শূন্য হয়ে চানা চিবিয়ে, পাগলপারা বেশে, বনে বনে কৃষ্ণ অন্বেষণ করে বেড়াতেন। এমনিভাবে কৃষ্ণবিরহে উন্মাদ হয়েছিলেন তিনি। কৃষ্ণবিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতেন– এরকম ছিল তাঁর দিব্য জীবন।

মাথুরবিরহ-কাতর ব্রজবাসীগণের শিরোমণি মহাভাবস্বরূপা শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী। শ্রীল আচার্যদেব– যাঁর নিত্যসিদ্ধ কিশোরী স্বরূপের নাম – শ্রীকমলিনী মঞ্জরী। তিনি শ্রীমতী রাধার অন্তরঙ্গা নর্ম্ম কিঙ্করী। তাই শ্রীল আচার্য্যদেবের দিব্যজীবন ছিল সেই অনুপম মাথুর বিরহের গানে ও ধ্যানে ভরা। বিশেষ করে তাঁর জীবনের অন্ত্যপর্বে সেই ভাবে তিনি সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায় তিনি নিরন্তর প্লুতস্বরে নামকীর্ত্তন করতেন। আর বিরহী মহাজনের গীত পদ্য সমূহের অনুকীর্ত্তন করতেন। সর্বদা শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্রের অসমোর্ধ্ব সৌন্দর্য্য, সৌস্বর্য্য, সৌগন্ধ, সৌরস্য, সৌকুমার্য্য, মাধুর্য্য, ঔদার্য্য প্রভৃতি নিত্যনূতনভাবে আস্বাদন করেও অতি কাতর কণ্ঠে ক্রন্দন করে বলতেন–

"অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি, হরে! ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো! করুণৈকসিন্ধো! হা হন্ত, হা হন্ত, কথং নয়ামি।।"

কখনো যমুনার তীরে বসে সারাটা দিন কাটিয়ে দিতেন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত একভাবে আবিষ্ট হয়ে বসে থাকতেন। দুটি চোখ থেকে ঝরে পড়তো মুক্তোর মতো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। ঠোঁট দুটি কান্নার বেগে কেঁপে কেঁপে উঠতো। কখনো উচ্চৈঃস্বরে কখনো বা লঘুস্বরে কতরকম স্তব পাঠ করতেন। যমুনার নীল জলে যখন সন্ধ্যার কালো ছায়া নেমে আসতো, তখন কচি শিশুর মতো ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠতেন আর গাইতেন বিরহের গান–

"গতো যামো গতৌ যামৌ গতা যামা গতং দিনম্।
হা হন্ত! কীং করিষ্যামি ন পশ্যামি হরের্মুখম্।।"

কখনো বা শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে বসে নিজেশ্বরীর সেবা বিরহে উৎক্ষিপ্ত হয়ে অতি করুণ সুরে বিলাপ করতেন। অতি উৎকট বিরহ অনলে দগ্ধীভূত হতো তাঁর সুকুমার হৃদয়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন আর গদগদস্বরে উচ্চারণ করতেন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বিরহ বিধুর পদ্য—

"ত্বদলোকনকালাহিদংশৈরেব মৃতং জনম্।
ত্বৎপাদাব্জমিলল্লাক্ষাভেষজৈর্দেবি জীবয়।।
দেবি তে চরণপদ্মদাসিকাং, বিপ্রয়োগভরদাবপাবকৈঃ।
দহ্যমানতরকায়বল্লরীং, জীবয় ক্ষণনিরীক্ষণামৃতৈঃ।।"

শ্রীরূপ-সনাতনের আদর্শ শ্রীল আচার্য্যদেব নিজের জীবনে আচরণ করে জগৎকে দেখিয়ে গেছেন। তাঁর উপর শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ ছিল শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচার করার জন্য। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশকে তিনি সম্পূর্ণ আচরণ মুখে প্রচার করে পালন করেছেন। এভাবে শেষ বয়সে শ্রীল আচার্য্যদেব সবসময় দিব্যোন্মাদে মত্ত থেকে শ্রীষড়গোস্বামীর ভজনাদর্শ জগতে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হন গৌর ভগবান্।।"

এরূপ তাঁর বৈরাগ্যময় জীবন, বেদনাময় জীবন, বিপ্রলম্ভময় ভজন জীবন। এটাই আমাদের ভজনের আদর্শ। দীর্ঘকাল এইভাবে খাওয়া-দাওয়া-নিদ্রাহীন অবস্থায় তিনি জীবন কাটিয়েছেন। এই সেই বৃন্দাবন ধাম যেখানে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সুতীব্র বিরহে অশ্রুজলে ৩৩ বৎসর কাটিয়েছিলেন। সেই ব্রজগোপীগণের সুতীব্র বিপ্রলম্ভময় ভজন শ্রীল আচার্য্যদেব বৃন্দাবনে দেখালেন। জগতের জীব তাঁর এই দিব্যোন্মাদময় বিপ্রলম্ভ ভজন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কিন্তু এটাই আমাদের ভজনের একমাত্র আদর্শ। এর অধিকার আমাদের নেই। এ অধিকার লাভের জন্য এই সকল আচার্য্যগণের

শ্রীচরণকমলে ক্রন্দন ছাড়া অন্য কোন গতি নেই। এটাই জীবের একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এঁদের পদরেণু লাভের আশাই আমাদের একমাত্র ভজন । এছাড়া আমাদের আর কোন ভজন নেই। তাঁদের পদরেণু হওয়াই আমাদের আত্মার real position একথা না বুঝলে আমরা রূপানুগ ভজন বুঝতে পারব না। এটাই আমাদের স্বরূপের একমাত্র অভিমান। তখন আমাদের আত্মাটা উৎকলিকা আকুলাত্মা হবে। This is the highest ambition of human life. যখন আমরা দীন হব, কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল হব, পুরীষের কীট হব, তৃণাদপি সুনীচ হব তখন তাঁদের কৃপায় এই সুদুর্লভ মহাপ্রেম সম্পদ লাভ হবে। এটাই শ্রীল আচার্য্যদেব নিজের জীবনে আচরণ করে দেখিয়েছেন। এটাই প্রকৃত শ্রীরূপানুগ ভজন। সাধক জীবনে বিপ্রলম্ভ নাম ভজন ছাড়া আর অন্য কোন ভজন নেই। এই বিপ্রলম্ভ প্রেম ধারার একমাত্র সাধন বিপ্রলম্ভ নাম ভজন। শ্রীল আচার্য্যদেব বললেন, বিপ্রলম্ভ নাম ভজন ছাড়া আমাদের বিন্দুমাত্র ভজন নেই। তাঁরা জগতে গোপীপ্রেম অর্থাৎ রাধাদাস্য প্রেম দান করতে এসেছেন। একমাত্র এই শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের কৃপায় এই প্রেম লাভ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব কেবলমাত্র এই রূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচার করলেন জীবের মঙ্গলের জন্য। তিনি জগতে বিপ্রলম্ভ প্রেমের প্লাবন এনেছিলেন। সেই প্রেমের প্লাবন আমাদের স্পর্শ হল না। শ্রীল গুরুদেব একমাত্র লাভ করেছিলেন। সেই বিপ্রলম্ভ প্রেমের এককণা, একটা স্ফুলিঙ্গ পাওয়ার জন্য আমরা অনুসন্ধান করছি। বৃন্দাবনের আকাশে, বাতাসে গোপীদের বিরহ প্রজ্জ্বলিত অনল ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে তাঁদের মৃতপ্রায় জীবনের দীর্ঘশ্বাস বাতাসে বইছে। সেই বাতাস আমাদের গায়ে লাগলে আমাদেরও শ্রীগৌরপ্রেম লাভ হয়ে যাবে। বিরহ ছাড়া আমাদের কোন উপায়ে রক্ষা নেই । বিরহই আমাদের একমাত্র ভজন। সুতরাং তাঁর প্রতি যাদের বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ

আছে তাদের সঙ্গ করলে আমাদের ভজন জীবন শেষ। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা ছাড়া অপরাধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। একমাত্র আমাদের এই গুরুধারাকে প্রগাঢ় প্রীতিভরে হৃদয়ে ধারণ ও বরণ করলে এ অপরাধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। যারা কেবল 'হা রাধে, হা কৃষ্ণ' বলে কাঁদবে, আর কিছু চাইবে না তারা এই গুরুধারার ভজন সম্পদের সন্ধান পাবে।

শ্রীল আচার্য্যদেব বৃন্দাবনে যমুনাতীরে, বর্ষাণা, নন্দগাও, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধনে গোপনে গোপনে বিরহে ভজন করেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব যে বিপ্রলম্ভভাবে শ্রীরূপ-রঘুনাথের practical ভজন দেখালেন তা জীবনে আচরণ না করলে আমাদের ভজন হবে না। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় আমি এ ভজন জেনেছি, তা বলে প্রাপ্তি হয়ে গেল তা নয়। প্রাপ্তির জন্য সুতীব্রভাবে ভজন করতে হবে। তবে শ্রীরাধা-গোবিন্দের রাস লীলা, নিকুঞ্জ লীলা, শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে সেবা লাভ হবে। এটাই শ্রীল আচার্য্যদেবের অবদান বৈশিষ্ট্য। তিনি বাইরের চাকচিক্য ছেড়ে দিয়ে ভজনের গভীরে প্রবেশ করলেন। শ্রীগুরুদেবকে প্রাণকোটিসর্ব্বস্ব রূপে হৃদয়ে বরণ করলে তবে এ ভজনে প্রবেশ লাভ হয়। তখন শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের দর্শন পাওয়ার জন্য চোখে ঘুম আসবে না।

শ্রীল আচার্য্যদেব মিশন ছেড়ে দিয়ে এই নিগূঢ়তম ভজন দেখালেন। তাঁর এই ভজন পথ অনুসরণ করলে সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গল, তা না হলে এই মঠ-মন্দির পৃথিবীর জগজ্জঞ্জাল হবে। কেবল খাওয়া-দাওয়া ইন্দ্রিয় তর্পণের আড্ডাখানা হবে। তিনি বলতেন, গৌড়ীয় মঠের একটা লোকও স্মরণ ভূমিকায় যাচ্ছে না। মায়াপুরে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা কালে মিশনের সেবকদের সুতীব্র ভজনের শিক্ষা দেন। দেখলেন একটাও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার লোক নেই, তাদের ভজনের উৎকণ্ঠা অত নেই দেখে তিনি বললেন, আমি অত ধীর গতিতে চল্‌তে

পারছি না। আমাকে একজন্মে কৃষ্ণ দর্শন করতে হবে। তখন তি
মিশন ছেড়ে শ্রীরূপ-রঘুনাথের আদর্শে ভজন করতে চলে গেলে
শ্রীল আচার্যদেবের এই লীলা সকল বুঝতে না পেরে আজ সমস্ত বি
তাঁর চরণে অপরাধে লিপ্ত। মহাজনের চরণে এই অপরাধের লে
থাকা পর্যন্ত কোটি কোটি জন্ম ভজনের অভিনয় করলেও শ্রীগৌরসুন্দ
ক্ষমা করবেন না। আমার গুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলো
গোস্বামী ঠাকুর কত কৃপা করে আমাদের সেই অপরাধের হাত থে
রক্ষা করেছেন। পরম বাৎসল্যঘনবিগ্রহ শ্রীল আচার্যদেব যদি অহৈতু
কৃপা করে আমাদের অপরাধ জর্জরিত হৃদয়ের মধ্যে তাঁর কোটিচ
সুশীতল পাদপদ্ম স্থাপন করেন, যদি তিনি আমাদের হৃদয়ে করু
ভরে পদচারণা করেন, তবেই আমাদের সিদ্ধি লাভ সম্ভব হবে। তাঁ
হৃদয়কমল হতে নিরন্তর এই করুণা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই গো
আনুগত্য বিনা, শ্রীগুরু আনুগত্য বিনা এই সুনির্মল বিপ্রলম্ভ ভজ
সম্পদ লাভ হবে না। এজন্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণকম
ঐকান্তিক প্রার্থনা আমাকে তোমাদের ভৃত্যানুভৃত্য করে, পদধূলি ক
শ্রীচরণকমলে স্থান দাও।

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃপুনঃ।
শ্রীমদ্রূপ পদাম্ভোজ ধূলি স্যাং জন্ম-জন্মনি।।"
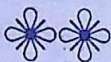
শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী ঠাকুর

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী ঠাকুর মহাবদান্য শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ। তিনি ব্রজের নিত্যসিদ্ধ প্রেমমঞ্জরী। তাঁর দিব্য চরিত ও লীলার মধ্যে স্বরূপানুবন্ধি নিত্যসিদ্ধ রূপটি প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি গোলোক থেকে এ ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীচৈতন্যবাণী সারা বিশ্বে আচার ও প্রচারের মাধ্যমে অখিল জীব নিচয়ের প্রভূত কল্যাণ ও নিত্য বাস্তব মঙ্গল বিধান করেছেন। অনাদি বহির্ম্মুখ কৃষ্ণভোলা জীবগণকে কৃষ্ণপাদপদ্মে উন্মুখ করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এমন কি লণ্ডনে গিয়েও তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য-সেবা উপাসনার কথা নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করেছেন। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এবং শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর কৃপা ও আশীর্বাদ তিনি লাভ করেছিলেন। রূপানুগ তিন আচার্যের কৃপাবারিতে পুষ্ট।

বাংলা ১৩১৬ সালের ১১ই চৈত্র ইংরাজী ১৯১০, ২৫শে মার্চ ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন শ্রীজগদীশ বাবু (শ্রীল তীর্থ গোস্বামী ঠাকুর) ত্রিপুরা রাজ্যের সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ ঘোষাল ভক্তিতত্ত্ব বাচস্পতি মহাশয়ের সঙ্গে ধুবুলিয়া ষ্টেশন থেকে পদব্রজে মায়াপুরে আসেন এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করেন। পূর্ব থেকেই বহু সজ্জন ব্যক্তি যোগপীঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীহরিকথা শুনছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ ঘোষাল শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীজগদীশ বাবুর পরিচয় করিয়ে দিলে শ্রীজগদীশ বাবু শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণে পতিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কৃপা যাচ্ঞা করলেন। শ্রীল ঠাকুর আশ্বাস দিয়ে বললেন,-"আপনি শিক্ষিত ও সম্মানিত ব্যক্তি, সুতরাং আপনি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কথা প্রচার করলে বহু লোক আকৃষ্ট হবে। আপনি মহাপ্রভুর জন্ম বাসরে কিছু হরিকথা বলুন। শ্রীল জগদীশ বাবু কারও কৃপা প্রণোদিত হয়ে 'ব্রহ্মচর্য্য' সম্বন্ধে এবং অতিমর্ত্ত্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অনুগমনে শ্রীনাম মাহাত্ম্য কিরূপে আচার ও প্রচার করছেন তা বললেন এবং আরও বললেন,–এই আত্মনিবেদন ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর হতেই,

"পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবেক মোর নাম।।"

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বাণীর পরিপূর্ণতা সাধিত হবে। ঐ দিন শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীজগদীশ বাবুকে প্রচুর হরিকথা শ্রবণ করান এবং বলেন আপনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশ নিয়ে আগামীকাল ওপারে কুলিয়ার চড়ায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী নামক এক অত্যদ্ভুত চরিত্র পরমহংস প্রবরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করুন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আদেশানুসারে যখন তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুমতি গ্রহণ করে ওপারে যেতে উদ্যত হলেন তখন শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তারপর দিন শ্রীগোদ্রুমে স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে যেতে বলে দিলেন। তিনি প্রাতঃকালে শ্রীল বাবাজী মহারাজের দর্শনে গেলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করে একটি তরমুজ ভেট দিলেন। যদিও ঐ মহাত্মা কারও কোন জিনিষ

গ্রহণ করেন না। তবুও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছ থেকে এসেছি শুনে ফলটি গ্রহণ করলেন। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর আদেশে সেখানে উপস্থিত হয়েছি শুনামাত্র শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের একটি প্রার্থনা কীর্ত্তন করতে আদেশ দিলেন। তিনি ঠাকুর মহাশয়ের— "গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।

হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর।।"

এই প্রার্থনা সঙ্গীতটি করলেন। কীর্ত্তন শুনে বাবাজী মহারাজ খুশী হয়ে বললেন,—"গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা বিশিষ্ট থাকবেন। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হয়ে শ্রীনামকীর্ত্তন করবেন। অসদ্‌সঙ্গ থেকে কায়-মনো-বাক্যে দূরে থাকবেন। শ্রীজগদীশ বাবু বললেন,- 'আমার এখনও গুরুপাদাশ্রয় হয় নি'। তাতে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন— 'আপনি তো শ্রীমায়াপুরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দর্শন পেয়েছেন। শ্রীমায়াপুর আত্মনিবেদনের স্থান। সেখানে যখন আপনি সদ্‌গুরু'র চরণে আত্মনিবেদন করেছেন তখন আর আপনার গুরুপাদাশ্রয় হয় নি কিরূপে?' শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন; যান, আপনি তাঁরই কৃপা গ্রহণ করুন। আরও বললেন—আপনাকে ভবিষ্যতে সদ্‌গুরুর নিকট থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে হবে। তখন তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে প্রণাম করলে তিনি কোন আপত্তি করেন নি। কিন্তু অন্য কেউ তাঁর পাদস্পর্শ করতে গেলে,- তোমার সর্বনাশ হবে, তোমার ভিটে মাটি উচ্ছন্নে যাবে—প্রভৃতি বলে ক্রোধ লীলা প্রকাশ করতেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের কথা শুনে জগদীশবাবু অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হয়ে কুলিয়ায় মস্তক মুণ্ডন করে ও গঙ্গা স্নান করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হলেন ঐদিন দুপুরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা প্রাপ্ত হয়ে কামবীজ ও কামগায়ত্রী লাভ করেন। তারপর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁকে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামৃত সম্বন্ধ জ্ঞান ও বিপ্রলম্ভ নাম ভজনের কথা বিশেষভাবে উপদেশ করেন।

কিছুদিন পরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশক্রমে কলিকাতার ভক্তিভবনে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁকে পঞ্চরাত্র মতে উপনয়ন সংস্কার এবং ব্রহ্ম গায়ত্রী ও গৌরাঙ্গ গায়ত্রী প্রদান করেন। তাঁর শ্রীভগবদ্ শাস্ত্র অনুশীলন ও সাধু-গুরু সেবা প্রবৃত্তি দেখে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে "ভক্তিপ্রদীপ" আখ্যা দেন। তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরে আদেশে প্রাতঃকালে কয়েকজন সেবকসহ শ্রীগোদ্রুম ধামে টহল দিতেন এবং এই কীর্ত্তনটি গাইতেন—'নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন। পাতিয়াছেন নামহট্ট জীবের কারণ।।' ইংরেজী ১৯২০ সালের ১লা নভেম্বর মাসে জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁকে ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাস প্রদান করেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করে শ্রীল গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট সেবা সম্পাদন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় ভারতের বাইরে লণ্ডনেও শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করে বহু সত্যানুসন্ধিৎসুকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করে শ্রীগুরুদেবের প্রভূত প্রীতিবিধান করেন। লণ্ডনে থাকাকালে তিনি শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন ব্যতীত 'শ্রীগুর্ব্বষ্টক' 'শ্রীচৈতন্যাষ্টক', 'শ্রীনামাষ্টক', 'শিক্ষাষ্টক', 'মনঃশিক্ষা', 'উপদেশামৃত', 'শ্রীদশমূল', 'শ্রীগুরুবন্দনা', 'প্রার্থনা', 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' ও সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের ইংরাজী অনুবাদ করেছেন। এছাড়াও আরও প্রায় পঞ্চাশটি ইংরাজী thesis প্রস্তুত করেছেন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত অবলম্বনে সরল ইংরাজী ভাষায় 'Career & Activities of sree Krishna Chaitanya and His Teachings' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে শ্রীবার্ষভানবীর নয়নতারা শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে সর্ব্বতোমুখী সেবা বিধান করে শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট জগতে স্থাপন করেছেন। তিনি

নিজের যথা সর্ব্বস্ব এবং ত্রিভুবনের যথা সর্ব্বস্ব সর্বক্ষণ শ্রীগুরুদেবের সেবায় নিযুক্ত করবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন এবং সকলে যাতে সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে সর্ব্বস্ব গুরুসেবায় নিযুক্ত হতে পারে তারজন্য শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ধরে শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের বিপ্রলম্ভময়ী দিব্য চেতনবাণী অক্লান্ত পরিশ্রম করে কীর্ত্তন করে বিশুদ্ধভাবে বিপ্রলম্ভ প্রেমমন্দাকিনী ধারাকে সংরক্ষণ করেছেন। তাঁর শ্রীমুখকমল থেকে উৎসারিত বীর্য্যবতী হরিকথামৃত নিষ্কপট চিত্তে সেবোন্মুখ হৃদয়ে পান করলে আমাদের সংসার বন্ধন চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং গোলোকের প্রেমরাজ্যে নিয়ে যাবে। তিনি বিপ্রলম্ভ নাম-প্রেমরসিক ছিলেন। বিপ্রলম্ভ নাম ভজন যে আমাদের আত্মার স্বাভাবিক ভজন তাই তাঁর বাণীর মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বিপ্রলম্ভ নামামৃত রসে তিনি নিত্য তন্ময়, আত্মহারা, বিহ্বল থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণ থেকে জীবনিচয়ের বিচ্ছেদগত ভজনই বিপ্রলম্ভ নাম ভজন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন ও তাঁর নিত্যসেবায় নিযুক্ত হওয়াই জীবাত্মার চির মঙ্গল ও শাশ্বত কল্যাণ। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ লীলাপীঠ শ্রীনীলাচলে শেষ জীবনে বিপ্রলম্ভ নাম রসে বিভোর হয়েছিলেন। তিনি নিত্যসিদ্ধ গৌরপরিকর বলে প্রথম জীবনে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন হতে শেষ জীবন পর্য্যন্ত শ্রীগৌর- নামের সেবা, গৌরধামের সেবা, গৌরলীলার সেবা নিরন্তর করে গিয়েছেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীগৌর ভক্তের মহিমা বলেছেন,—

"সকৃন্নয়নগোচরীকৃত-তদশ্রুধারাকুল-
প্রফুল্লকমলেক্ষণ-প্রণয়কাতর-শ্রীমুখঃ।
ন গৌরচরণং জিহাসতি কদাপি লোকোত্তর-
স্ফুরন্মধুরিমার্ণবং নবনবানুরাগোন্মদঃ।।"

বিপ্রলম্ভ রসময় শ্রীগৌরসুন্দরের এই রূপমাধুর্য্য দর্শন করে তিনি নিরন্তর বিপ্রলম্ভ সুরে "হা গৌর, হা নিতাই" এই বলে আহ্বান

করতেন। তাঁর নয়ন দুটি সর্বদা অশ্রু জলে অভিসিক্ত থাকত। তিনি সর্বদা অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারে বিভূষিত থাকতেন। তাঁর প্রপঞ্চ থেকে নিত্যধামে গমন লীলাটিও অত্যদ্ভুত। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ লীলা দর্শন করতে করতে অতি করুণস্বরে নত শিরে 'হা গৌর! হা নিতাই! হা গদাধর!' বলতে বলতে নিত্যধামে শ্রীগৌর-নিতাই, শ্রীগৌর-গদাধরের চরণতলে সেবায় সমাধিস্থ হলেন।

হা হা প্রেম মঞ্জরী তব লীলা সুমাধুরী
শ্রীভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী।
বিরহ বিধুর চিত্ত রাধা সেবানুরক্ত
নামরসে সদা মগ্ন তুমি।।
ভাবসেবা সম্বন্ধ উদয়ে অন্তর্মুখী মন
বিপ্রলম্ভ রসের লক্ষণ।
অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার অশ্রু-কম্প-পুলকাদি
তব চিন্ময় দেহে প্রকটন।।
প্রেমে অশ্রুধারা নদী বহিয়া চলে উছলি
চটক পর্বত পাদদেশ।
চিদ্-মিথুন লীলা বিলাসে মত্ত পরাণ
বিপ্রলম্ভ রসে সদা ভাস।।
হা হা শ্রীগৌরসুন্দর হা হা শ্রীরাধাকিশোর
দিব্যোন্মাদ রসে নিমগন।
দীন হীন ভারতীর নিত্যসিদ্ধ স্বরূপে
কবে ধ্যানে ভাসিবে অনুক্ষণ।।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নৃত্য-সঙ্কীর্ত্তনোল্লাসিন্
শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীভক্তিবিনোদ ধারায় আগত মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গোস্বামী ঠাকুর— মহাভাগবতোত্তম, ত্রিকালজ্ঞ , দিব্যদ্রষ্টা শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন। শ্রীভক্তিবিনোদের কৃপাপুষ্ট এঁরা সকলেই। সকলেই তাঁর নিত্য পরিকর। তাঁর কৃপা আশীর্বাদের ফলে এই শুদ্ধ ভক্তি গঙ্গাধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় এই ধারা ভূতলে নিত্য প্রকট থাকবে। শ্রীল গুরুমহারাজ চার আচার্য্যের আশীর্বাদের ফলে এই ধারাতে তিনি নুতন বৈশিষ্ট্য আনলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর জীবনে মূর্ত্তি ধারণ করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্ত্ত বিগ্রহ তিনি। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে যে ভাবে অনুশীলন, আস্বাদন, পঠন, সুপঠন ও বিচারণ করেছেন তা অত্যদ্ভুত ও অনবদ্য। তাঁর শ্রীহরিকথা সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও রসময়। শ্রবণ করলেই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কথার মধ্যে এত রসমাধুর্য্য, ভাবমাধুর্য্য, ভাষার মাধুর্য্য ও অপূর্ব মৌলিক অবদান সকল প্রাণীকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও চমৎকৃত করে। তাঁর বর্ণন পরিপাটী অনন্যসাধারণ ও অদ্বিতীয়। ভাগবতবাণীই তিনি কীর্ত্তন করেছেন অথচ আলাদা কায়দায়- আলাদা ভঙ্গীতে। তাঁর শ্রীমদ্ভাগবতের পরিবেশন প্রণালী অত্যদ্ভুত। শ্রীল গুরুমহারাজের প্রেমরস পূরিত হৃদয় পদ্মদলে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ নিরন্তর প্রেমলীলারসে মগ্ন ও নিত্য বিহার করছেন। সেই প্রেম থেকে উত্থিত বাণী

প্রেমময়, রসময়। ইহা শ্রীমদ্ভাগবত রস নিষেবন- রস সিঞ্চিত বাণী। শ্রীগুরুপরম্পরায় আগত - গলিত অমৃতদ্রবযুক্ত বেদবাণী, ভাগবতবাণী।

মাদৃশ জীব তাঁর সেই অমৃত আকর্ষণী বাণী শ্রবণ করে তাঁর শ্রীচরণে ছুটে এসেছে। আমি মহাবিদ্যাগ্রস্থ। কোটি কোটি অনর্থে ভরা, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন- পাপী, অপরাধী, বিষ্টার ক্রিমি কীটকে তাঁর চরণতলে ধরে এনেছেন এবং কৃপা করে শ্রীচরণছায়ায় স্নেহে সেবা দান করেছেন। হরিকথামৃত রস পান করাচ্ছেন এবং পালন করছেন। তোমার এ করুণার কথা, মহা বাৎসল্যের কথা, মহা মহা বদান্যতার কথা, মহা মহা ঔদার্য্যের কথা নিত্যকাল যেন স্মরণ করতে পারি। আমার আর অন্য কোন কাজ নেই। তোমার মহিমা আমার মতো দীন, অযোগ্য এবং অল্প ভাষা জ্ঞানের দ্বারা কি করে বর্ণন করবো? শ্রীল গুরুমহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথিবরায় ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হয়ে শ্রীল প্রভুপাদের অসমোর্দ্ধ মহাকরুণার-কথা আরম্ভ করা মাত্রেই অজস্র অশ্রুধারায় স্বীয় বক্ষকমলকে প্লাবিত করতেন। ইহা আমরা সকলেই দর্শন করেছি। শ্রীল গুরুদেব যে কি বস্তু, গুরুতত্ত্ব যে একটা আলাদা, peculiar তত্ত্ব। তাঁর সঙ্গে অন্য কোন তত্ত্বের উপমা চলে না, তিনি একাধারে শ্রীগৌর- কৃষ্ণের করুণা শক্তি, নিত্যানন্দ তত্ত্ব, অদ্বৈত তত্ত্ব, গদাধর তত্ত্ব। এছাড়াও একটি গোপন তত্ত্ব হলো - তিনি সাক্ষাৎ রাধারাণী। শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিষয় বিগ্রহ ও আশ্রয় বিগ্রহের অপূর্ব সমাবেশ হয়েছে বলে 'গুরুতত্ত্ব' এতই মধুর, উদার ও করুণায় ভরা। সেই গুরুপাদপদ্মের মহিমা বলতে বলতে তিনি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারে বিভূষিত হতেন। সেই অপ্রাকৃত অলৌকিক দৃশ্য স্মৃতির মুকুরে আজও নিত্য নবনবায়মানভাবে বিরাজিত।

যেখানে অনন্তদেব নিজ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করে শেষ করতে পারছেন না। সেই বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অলৌকিক অত্যদ্ভুত দয়ার, ক্ষমার, করুণার কথা আমি কি করে বর্ণন করবো? শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তন করতে গিয়ে বলেছেন যে – এই একটি জীবনে

একটি জিহ্বায় তাঁর অসমোর্দ্ধ অলৌকিক গুণ মহিমা কি বলবো-- যদি কোটি কোটি জিহ্বায়, কোটি কোটি বৎসর পরমায়ু লাভ করি তবে সেই দয়াসিন্ধু, করুণাসিন্ধুর একটি বিন্দুও বর্ণন করতে পারি না। অন্যের কা কথা স্বয়ং ভগবানও এই গুরুপাদপদ্মের দয়া, ক্ষমা, করুণা উদারতা দেখে বশীভূত হয়ে যান। শ্রীগৌর-কৃষ্ণ তাঁকে কোথায় রাখবেন অর্থাৎ মাথায় রাখবেন-না কোলে রাখবেন-না স্কন্ধে রাখবেন ঠিক করতে পারেন না।

শ্রীল গুরুমহারাজের অবদান অনন্ত। তিনি কেবলা প্রেম ভক্তির আচার্য্য। তিনি প্রয়োজন তত্ত্বের আচার্য্য। তিনি আচার্য্য লীলার দুটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা রূপানুগা ধারার উজ্জ্বলতা বর্ধন করেছেন। শ্রীনাম সংকীর্ত্তন ও শ্রীবিগ্রহারাধনা। শ্রীগৌরসুন্দর সংকীর্ত্তনৈক পিতা। শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা করেছেন–কীর্ত্তনের রাজধানী এই গোদ্রুম ধামে। শ্রীল প্রভুপাদ-শ্রীল আচার্য্যদেব এঁরা শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করেছেন–কিন্তু তিনি বহুলভাবে বিচিত্র সেবার ভাণ্ডার খুলে জীবের অনাদি কালের বহির্ম্মুখ চিত্তকে উন্মুখ করে শ্রীভগবৎ সেবায় লগ্ন করেছেন। এটি তাঁর আচার্য্য লীলার মহান্ অবদান। শ্রীরাধাকুণ্ডতটাভিন্ন শ্রীগোদ্রুমধামে সুরম্য মন্দির স্থাপন করে, প্রাণের ঠাকুরকে বসিয়ে সেখানে অষ্টকালীয় কুঞ্জসেবা রচনা করলেন-- শ্রীনামসংকীর্ত্তনের দ্বারা। নাট্য মন্দিরে ভোর ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্য্যন্ত নিরন্তর নাম সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেছেন। সেই সেবায় সকলকে নিয়োজিত করেছেন। শ্রীনবদ্বীপ ধামে-মায়াপুরে, স্বানন্দসুখদ কুঞ্জে, নৃসিংহ পল্লীতে, মোদদ্রুম দ্বীপে, সীমন্তদ্বীপে, শ্রীক্ষেত্রধামে- শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে, গুণ্ডিচা মন্দিরে, রথযাত্রায়, গম্ভীরাতে এবং শ্রীব্রজধামে-নন্দগ্রামে, বর্ষাণায়, সেবাকুঞ্জে, নিধুবনে, বংশীবটে, ধীরসমীরে, রাধাকুণ্ডে, গোবর্ধনে, শ্যামকুণ্ডে সর্বত্র শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত করেছেন।

"কলিকালের ধর্ম–কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা তার নহে প্রবর্ত্তন।।"

এইসব রূপানুগ মহাজনগণ শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞায় পৃথিবীতে এসে গোলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু বিতরণ করলেন।

"গোলোকে গোপনে ছিল নিতাই এনে বিলাইল।"

"তদ্ধিতত্তদ্ব্রজক্রীড়া-ধ্যানগান প্রধানয়া
ভক্ত্যা সম্পদ্যতে প্রেষ্ঠ-নামসংকীর্ত্তনোজ্জ্বলম্।।"(বৃঃ ভাঃ)

গোলোকের প্রেম হল শ্রীনাম সংকীর্ত্তন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই শ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রীগৌরকিশোর-শ্রীল প্রভুপাদ-শ্রীল আচার্য্যদেব-শ্রীল তীর্থ মহারাজ-শ্রীল গুরুমহারাজ রূপে বারবার আবির্ভূত হচ্ছেন। শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ একাধারে শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন বন্যার দ্বারা জীব উদ্ধার করেন এবং অন্য দিকে মঞ্জরী স্বরূপে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রসাস্বাদন ও সেবা বিতরণ করছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গোস্বামী ঠাকুর যে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য অন্তরঙ্গ পরিকর- তা তাঁর সমগ্র লীলাবলীতে প্রস্ফুটিত হয়ে পড়েছে। তাঁর এই গৌরজনত্বের স্বরূপ বিশ্বমাঝে উন্মোচিত করেছেন। তাঁর স্বাভাবিক সেবা বা স্বারসিকী নৃত্য সেবার দ্বারা তাঁর গৌরজনত্ব অনুভূত হয়। শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের তোষণে সতত মত্ত। কেবল সংকীর্ত্তন করেন নি-নৃত্য সহযোগে সংকীর্ত্তন করেছেন। তিনি বলতেন- " কীর্ত্তন দুধের মত, নর্ত্তন দুধের সর। নৃত্যের দ্বারা হৃদয়ের ভাব প্রকাশিত হয়। হৃদয়ে রস না থাকলে, উল্লাস না থাকলে নৃত্য আসবে না। সকলে নৃত্য সেবা করতে পারে না। নৃত্য ভক্তির গাঢ় অবস্থা। নৃত্য ঘন দুধের সর।" শ্রীগৌরসুন্দর নর্ত্তনীয়া ছিলেন। তিনি নিরন্তর নৃত্যে বিভোর থাকতেন।

"নাচে শচীনন্দন দেখে রূপ-সনাতন
গান করে স্বরূপ-দামোদর।"

আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহ রাত্রিবেলা শ্রীবাস অঙ্গনে নৃত্যসংকীর্ত্তন করতেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সেই লীলা দর্শনের ভাগ্য আমার হয় নি। কিন্তু শ্রীল গুরুমহারাজের এই মহাপ্রেমের নৃত্য দর্শন করে

আমরা সকলে আত্মহারা হয়ে গেলাম। এতদিন শ্রীগৌরসুন্দরের
মহাগাম্ভীর্য্যময় লীলার কথা গ্রন্থে পড়েছিলাম, শুনেছিলাম কিন্তু আজকে
সেই লীলা সাক্ষাৎ দর্শন করে মুগ্ধ, বিস্মিত ও চমৎকৃত হলাম। শ্রীল
গুরুমহারাজ বিভিন্ন মন্দিরে প্রীতিভরে দণ্ডবৎ, প্রেমভরে নৃত্য, স্তব-স্তুতি
কীর্ত্তনারতি লীলা প্রকট করলেন। স্বানন্দসুখদকুঞ্জে ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ
ভজন মন্দিরের তলে অবলুণ্ঠন, শ্রীনৃসিংহ মন্দিরে দীর্ঘ সময় ধরে নৃত্য,
শ্রীগৌর জন্মোৎসবে প্রেমোন্মত্ত হয়ে উদণ্ড নৃত্য, শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠে
প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম ইত্যাদি ভক্ত হৃদয়ে চির স্মরণীয় হয়ে আছে।
তিনি শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে নৃত্যকীর্ত্তন-আরতিতে দিব্যপ্রেমভাবে উন্মত্ত
হয়ে আবাল বৃদ্ধ-বনিতা, পাপী-তাপী-পতিত আচণ্ডালকে নৃত্যকীর্ত্তন
প্রেমরসে উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত করেছেন। সকলের চিত্তকে অমৃতধারায়
সিক্ত করেছেন। এছাড়াও রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথ-দর্শনকালে শ্রীল
গুরুমহারাজের লীলা দেখে শ্রীগৌরসুন্দরের রথযাত্রার স্মৃতি স্বাভাবিক
ভাবে স্মৃতিপথে উদিত হয়ে থাকে।

"রথারূঢ়স্যারাদধি পদবী নীলাচলপতে-
রদভ্র- প্রেমোর্মি স্ফুরিত নটনোল্লাস বিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভি পরিবৃত তনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্য কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।।"

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলার প্রতিচ্ছবি শ্রীল গুরুমহারাজের মধ্যে দেখতে
পাই। তিনি যে শ্রীগৌরসুন্দরের পরিকর তা তাঁর এই নৃত্য-সংকীর্ত্তনাবলীর
মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে। নৃত্য-সংকীর্ত্তন গোলোকের একটি বিশিষ্ট সেবা।
শ্রীগৌর-লীলায় নৃত্য-সংকীর্ত্তন মুখ্য এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় মঞ্জরীগণ নৃত্য
কলায় ও সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী। শ্রীল গুরুমহারাজের বিচিত্র লীলাবলী
ঔড়ুলোমি লীলা মাধুরীতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁর দিব্যপ্রেমোন্মাদ
লীলা বর্ণন প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ বলা হল। শ্রীল গুরুদেব এই দুটি শ্লোকের মূর্ত্ত
বিগ্রহ ছিলেন. তাঁর সমগ্র লীলায় আচরণ মুখে প্রচার দৃষ্ট হয়।

"মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীতবাদিত্র-মাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।
শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা শৃঙ্গার তন্মন্দির-মার্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।"

তিনি জগৎকে এক অভিনব শিক্ষাদান করলেন তা হল, শ্রীবিগ্রহ আরাধনার মাধ্যমে অষ্টকালীয় কুঞ্জসেবা রচনা। তিনি সর্বক্ষণ আমাদিগকে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীবিগ্রহগণের প্রীতিময়ী বিচিত্র মধুর সেবায় নিয়োজিত রেখে শ্রীগৌরভক্তিরস, গৌরপ্রীতি রস, গৌরসেবা রস আস্বাদন করালেন। শ্রীবিগ্রহগণের এমন প্রাণবন্ত সেবা প্রচেষ্টা, এমন হার্দ্দিক প্রেমভরা বিচিত্র মধুর সেবা বর্ত্তমান জগতে কোথাও এমন দেখা যায় না। শ্রীবিগ্রহগণের বিভিন্ন কালোপযোগী বিভিন্ন ভোগরাগ, বিচিত্র পোষাক ও অলংকারের শৃঙ্গার ও ফুলের বিচিত্র শৃঙ্গার, ফুলের মুকুট ও মালা ইত্যাদি অনুপম সুখকরী সেবায় শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ যে কত আনন্দরসে নিমজ্জিত হতেন তার ইয়ত্তা নেই। তিনি শ্রীনাম সংকীর্ত্তন ও শ্রীবিগ্রহগণের সেবায় আমাদিগকে আত্মনিয়োগ করার জন্য বারংবার উদাত্ত কণ্ঠে এই দুটি ভক্ত্যঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করেছেন। এছাড়াও শ্রীগৌরধাম, শ্রীক্ষেত্রধাম ও শ্রীবৃন্দাবন ধামের অত্যজ্জ্বল মহিমার কথা কীর্ত্তন করেছেন এবং হৃদয়ে সেই অত্যদ্ভুত মহিমার বাস্তব অনুভূতি প্রদান করে আমাদিগকে নিরন্তর শ্রীধামের সেবায় আকৃষ্ট করে রেখেছেন। শ্রীল গুরুদেব সুদীর্ঘ ২৮ বছর আচার্য্য লীলাকালে সমস্ত জীব জগতকে গৌর- প্রেমে-কৃষ্ণপ্রেমে, গৌরসেবায়-কৃষ্ণসেবায়, গৌরকীর্ত্তনে-কৃষ্ণ কীর্ত্তনে মুখরিত সঞ্জীবিত ও উদ্বোধিত করেছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ নাম সংকীর্ত্তনের অমৃতধারা ইনিই জগতে সংরক্ষণ, প্রচলিত ও প্রাণবন্ত রেখেছেন-একথা অতীব সত্য। শ্রীল গুরুদেবের সঙ্গে শ্রীবিগ্রহের লীলা নিত্য নূতন ও অনন্ত। তাঁর একদিনের

লীলাবলী বর্ণন করা মাদৃশ জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু মাধুর্য্য সিন্ধুর তীরে বসে বিন্দু আস্বাদন করেই মুগ্ধ হয়ে যাই। মহামহাবদান্য ঠাকুর নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব সকলকে আকর্ষণ করেছিলেন - তাঁর নিত্যসিদ্ধ অলৌকিক গুণ রাশির দ্বারা।

"ত্বৎ-প্রেমরূপগুণসিন্ধুকণানুভূতে-
দাসীভবাম্যহমপীতি সদাভিমন্যে।" (প্রেমসম্পুট)

শ্রীলগুরুদেবের প্রেম, রূপ ও গুণ সমুদ্রের একটিমাত্র কণা অনুভব করে হাজার হাজার শিষ্য তাঁর চরণকমলে দাস্য লাভের জন্য আকর্ষিত হয়ে এসেছিলেন। আমরা সকলে তাঁর দাস্য লাভের আশায় বসে আছি। তাঁর অপ্রাকৃত দিব্য অলৌকিক গুণসিন্ধুর বিন্দুমাত্র আস্বাদন করতে পারলে আমরা তাঁর দাস্য সমুদ্রে নিমজ্জিত হবো।

শ্রীল গুরুদেব দিবারাত্র শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দদেবের অসহ্য বিচ্ছেদ বেদনায় কাল কাটাতেন। মঞ্জরী-ভাব সাধনায় তিনি স্বতঃসিদ্ধ দিব্যদ্রষ্টা ঋষি। তিনি শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা কিঙ্করী-- শ্রীবিনোদিনী মঞ্জরী। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সর্বেন্দ্রিয়ের বিনোদ- কারিণী। তিনি শ্রীভক্তিবিনোদের বিনোদ বা আনন্দদায়িনী। শ্রীল গুরুদেব প্রেমরসের আকর বলে প্রেমময় লীলা করেছেন ও প্রেমধন বিতরণ করেছেন। শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জে, নীলাচলে, গম্ভীরায়, আলালনাথে, বৃন্দাবনের নিধুবনে, সেবাকুঞ্জে, শ্রীরাধারমণে, রাধাকুণ্ডে, শ্রীদাসগোস্বামীর সমাধি মন্দিরে তাঁর নিত্যসিদ্ধ মঞ্জরী স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। তিনি ঐ ঐ স্থানে মঞ্জরী ভাবে নিত্যারতি সেবা করেছেন। শ্রীল গুরুদেবের অন্তরের সুগোপন মণিকোঠায় লুক্কায়িত কুঞ্জ সেবার নিগূঢ় বৈশিষ্ট্য, উৎকর্ষ ও চমৎকারিতা তাঁর বিশেষ অনুগত স্নিগ্ধ অন্তরঙ্গ শিষ্য-শিষ্যাকে জানিয়ে ছিলেন গোপনে গোপনে। সর্বস্তরের শিষ্যগণের জন্য তিনি এই মঞ্জরীভাব সাধনের শিক্ষা প্রদান করেন নি। কেবলমাত্র সেই রসের

অধিকারীদের জানিয়েছিলেন। এই সুগোপ্য মঞ্জরীভাব সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ কথা হলো বিপ্রলম্ভভাবে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীবিগ্রহারাধনা। বিপ্রলম্ভ প্রেমরসে তিনি সর্বদা বিভাবিত থাকতেন। তাঁর বিরহ বিধুর কান্নায় শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জের প্রাঙ্গণ অভিসিঞ্চিত থাকতো। গভীর রাত্রে নির্জনে প্রিয়তমের সুমধুর নাম বিরহের সুরে কীর্ত্তন করতেন। অতি প্রত্যুষে আমরা দণ্ডবৎ প্রণাম করতে গেলে দেখতাম--সারারাত্রি ধরে প্রিয়তমের বিরহ ব্যথায় কেঁদে কেঁদে দু-চোখ ফুলে গেছে। এর সন্ধান পৃথিবীর খুব অল্প লোকই জানেন। শ্রীল গুরুদেবের হৃদয় সমুদ্রের মতো গম্ভীর অথচ বাহির থেকে তার তরঙ্গ দেখা যেত না। শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জে গুরুগৃহসেবা তথা কুঞ্জসেবা যে ভজনের পরাকাষ্ঠা--সেই সুগোপন রহস্য কৃপা পূর্বক প্রকাশ করলেন শ্রীভক্তিকেবল। তাঁর প্রাণকোটিসর্বস্ব শ্রীগোদ্রুমবিহারীর অষ্টকালীয় প্রেম সেবা রচনায় নিত্য তন্ময় হয়ে থাকতেন শ্রীলগুরুদেব। অনুগত স্নিগ্ধ শিষ্যদের হাতে কলমে সেই কুঞ্জসেবা শিক্ষা দিলেন। তিনি নৈরন্তর্য্যময়ী এই প্রেম সেবার মধ্যে সহজ সমাধিস্থ হয়ে থাকতেন। তাঁর ভজনাদর্শের মূল কথা হলো –

"তৃণাদপি সুনীচের্ন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।"

তিনি এই শ্লোকের মূর্ত্ত বিগ্রহ–জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁর অত্যদ্ভুত জীবন চরিতের গভীর তলদেশ অনুসন্ধান করলে এই মূল আদর্শকে আমরা নিরন্তর দেখতে পাই। তিনি বলতেন–ছেলেবেলায় আমার পড়ার ঘরে শ্রীমহাপ্রভুর এই দুটি শ্লোক লিখে রেখেছিলাম–

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।"

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।"

তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে শ্রীমহাপ্রভুর এই শিক্ষাকে জীবনে আচরণ করে চলেছেন এবং অনুগত শিষ্য-শিষ্যাগণকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত হবার জন্য নিরন্তর প্রেরণা দান করেছেন। শ্রীল গুরুদেব শ্রীভক্তিবিনোদ ধারায় আবির্ভূত হয়ে রূপানুগ ভজন পদ্ধতির সার নির্যাস, মর্ম্মকথা, নিগূঢ় শিক্ষা দিচ্ছেন। রূপানুগ ভক্তির প্রথম কথাই হল তৃণাদপি সুনীচ ও অমানী মানদ। এই শ্লোকটি ব্রজাভিযানের মূলমন্ত্র। তাঁর প্রতিটি কথায়, প্রতিটি ভঙ্গীতে, প্রতিটি শিক্ষায়, প্রতিটি আচরণে ব্রজ রসাস্বাদনের এই মূল মন্ত্রটি বিচ্ছুরিত হতো। তিনি মহিলা ভক্তগণের প্রতি অসীম কৃপা, অফুরন্ত স্নেহবারি বর্ষণ করেছেন। মহিলা ভক্তগণের ভজনের উন্নতি বিধানের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিকট স্ত্রী-মূর্খ-পতিতকে সুদুর্লভ কৃষ্ণভক্তি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। আজ আমরা চোখের সামনে সেই লীলার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি। শ্রীগুরুদেবের কাতর প্রার্থনায় শ্রীগৌরসুন্দর মহিলা ভক্তগণকে শুদ্ধ প্রেমভক্তি সাধনের অপূর্ব সুযোগ দান করেছেন। তারা যাতে ধামে থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আদর্শে নাম ভজন করতে পারে সেজন্য সুব্যবস্থা করেছিলেন। সেজন্য তাদেরকে প্রতিদিন 'আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি' কীর্ত্তন শিখাতেন। শ্রীগৌরসুন্দরের বিচিত্র সেবা সুখ রচনার জয়যাত্রায় বিভোর হয়ে তিনি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছেন—এমন উদার, এমন মধুর, এমন মহান্, এমন স্নেহময়, এমন প্রেমময়, এমন নিত্য মঙ্গলময় শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ, কৃপা ও সেবা লাভ করে আমরা ধন্য হয়েছি। এ যে আমাদের কত বড় ভাগ্য তা বলার ভাষা নেই। আমরা কোথায় নরকের কীট বিষয় বিষ্ঠায় ডুবেছিলাম- সেখান থেকে তুলে এনে অমৃত রস পান করালেন। এত বড় দয়া-করুণা গৌর ভক্ত ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীগুরুদেবের ভূতলে আসার অবদান হলো--বিপ্রলম্ভ

নাম ভজন। শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণীর সম্পদ এটা। তিনি আচরণ করে দেখিয়েছেন। শ্রীমতীর কায়ব্যূহ বলে শ্রীগুরুবর্গও এই বিপ্রলম্ভ নাম ভজন সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁরা পৃথিবীতে এসে এই নিগূঢ়তম রহস্যঘন ভজন বৈশিষ্ট্যরূপ বিপ্রলম্ভ নাম জগতের জীবকে দান করার জন্য আসেন। সম্ভোগে মত্ত জীব। কি করে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে আরাধনা করতে হয় জানে না। তাই শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর অভিন্ন তনু ধারণ করে জগতে এসে এই বিপ্রলম্ভ নাম ভজন শিক্ষা দেন। তাঁর অনন্ত শিক্ষার মধ্যে আর একটি শিক্ষা আস্বাদন করার চেষ্টা করছি।

শ্রীল গুরুদেব আমাদেরকে শত শতবার, লক্ষ লক্ষবার, অসংখ্যবার এই উপদেশামৃতটি শ্রবণ করিয়েছেন।

"অনিন্দুক হৈয়া যে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে,
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিবে হেলে।।"

* * *

"কাহারে না করে নিন্দা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
অজেয় চৈতন্য সে জিনিবেক হেলে।।"

তিনি বলতেন-কাহারও নিন্দা সমালোচনা করা, বলা, শুনা, লিখা খারাপ। এ সব ভক্তি হানিকর। এমন কি যারা মনে মনেও নিন্দা করে তারা বেশী শয়তান। যারা নিন্দা সমালোচনা করে তাদের কোন ভজন নেই। তাদের কোন জন্মেও ভজনের আশা নেই। সেইরূপ নিন্দাকারীর সঙ্গ হতে কোটি যোজন দূরে অবস্থান করতে হবে। নিন্দা সমালোচনা ত' দূরের কথা এমন কি কারুর দোষ দর্শন করাও ভক্তি হানি কর। কারুর দোষ দেখতে নেই, বলতে নেই, শুনতে নেই, লিখতে নেই। এমনকি বহির্মুখ এবং বিদ্বেষীরও নিন্দা-সমালোচনা করতে নেই। শ্রীল গুরুমহারাজ এ বিষয়ে বার বার আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অপ্রকটের পর আমরা

সেই শিক্ষা আচরণ করতে পারছি না। অপরের গুণ দর্শন করতে বলেছেন এবং নিজের দোষ দর্শন করতে বলেছেন। এরূপ ভাবে যদি চলতে পারি তবে আমাদের ভজনে উন্নতি হবে। ভজন-সাধনে উন্নতি লাভ, প্রেমলাভ করতে চায় যারা তারা যেন শ্রীগুরুদেবের উপদেশামৃতটি অক্ষরে অক্ষরে সর্বক্ষণ, প্রতিক্ষণ, প্রতিপদ বিক্ষেপে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে পালন করে। তাছাড়া অদোষদরশী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আরাধনা করতে হলে আমাদেরকে অনিন্দুক হতে হবে। অনিন্দুক না হলে শিষ্য বলে পরিচয় দেওয়া যায় না।

শ্রীগুরুদেব নিত্য ব্রজবাসী। নিত্য শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবাসী। তিনি আমাদের অসামান্য অসাধারণ দৈন্যভাব সাধন করার জন্য কোটি কোটি বার উপদেশ দান করলেও আমি তাঁর এই শিক্ষামৃত পালন করতে অসমর্থ। কেন না, আমার ভিতরে অসামান্য দীনতা আসে নি। এই দীন ভাব নিষ্কপটে কায়-মনো-বাক্য দিয়ে আচরণ, সাধন, practice সারা জীবন করতে হবে। এটা জানলে, শুনলে, বক্তৃতা দিলে হবে না। এটা হৃদয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করাবার জন্য তিনি বহুবার প্রবল যত্ন করেছেন। এই মহাপুরুষের পাদপদ্মের একটি ধূলিকণার মহিমা কীর্তনের বিন্দুমাত্রও যোগ্যতা আমার নেই। তবু কিছুদিন তাঁর চরণকমলের নীচে এই অভাগাকে ঠাঁই দিয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর বহুবিধ অলৌকিক লীলা সন্দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে এবং তাঁর অহৈতুকী কৃপায় শ্রীভক্তিবিনোদ ধারার আচার্যগণের দিব্য ভজন মাধুরী বর্ণিত হল। শ্রীরূপানুগাচার্যগণের এই লীলা মানবের ধারণার অতীত ও বর্ণনার অতীত। জন্ম জন্ম ধরে তাঁর রাতুল অশোক অভয় সুশীতল শ্রীচরণের ধূলিকণা হয়ে, দীনতম সেবক হয়ে থাকতে পারি ইহাই আমার আন্তরিক নিষ্কপট আকুল প্রার্থনা।

শ্রীশ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গুরুতত্ত্ব

" বেদশাস্ত্র কহে, সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি প্রেম তিন মহাধন ।। "

প্রপঞ্চের জীবগণ এই কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্ব জানতে পারে একমাত্র সদ্‌গুরুর কৃপায়। যিনি এই প্রপঞ্চে জগদ্‌গুরুর কার্যকরে থাকেন। তিনি এই তিন তত্ত্বে অভিজ্ঞ। দিব্য ভগবদ্ দ্রষ্টা ও ভগবৎ তত্ত্বে কুশলী। তিনি এই তত্ত্বকে সম্পূর্ণ রূপে জানেন । সেই দিব্য দ্রষ্টা মহাপুরুষের শ্রীচরণাশ্রয়ে জীব কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি লাভ করতে পারে। অন্য কোন উপায়ে এই কৃষ্ণ প্রেম ধন লাভ করা যায় না। যিনি প্রেমতত্ত্ববিদ্, যিনি প্রেমের স্বরূপ অবগত আছেন, যিনি প্রেম নিয়ে খেলা করেন তিনি প্রেমিক।

" ভ্রাতঃ প্রেম্ণঃ স্বরূপং জানন্তি তদ্বিদঃ।
যস্য চিত্তার্দ্রতা-জাতং বাহ্যং কম্পাদিলক্ষণম্।।"

(বৃ:ভা:- ২/৫/২২৬)

যিনি প্রেমের স্বরূপ সম্যক্ রূপে অবগত সেইরূপ মহা-পুরুষের শ্রীচরণাশ্রয় করে জীব মহাদুর্লভ কৃষ্ণ প্রেমধন লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করে। এখন প্রশ্ন হতে পারে জগদ্‌গুরু বা সদ্‌গুরু কে ? তাঁর লক্ষণ কি? বা তাঁকে চেনা যাবে কি করে ? এই সব প্রশ্নের সহজ সমাধান শাস্ত্রকারগণ নির্ধারণ করেছেন। আমরা শাস্ত্রের সেই সকল বাণী একত্র সংগ্রহ করে 'গুরুতত্ত্ব' আকারে এখানে প্রকাশ করা চেষ্টা করছি। জগদ্‌গুরুর কিছু লক্ষণ এখানে বলা হচ্ছে। 'গুরুতত্ত্বে'র মধ্যে আমরা তা পর পর জানতে পারব। জগদ্‌গুরুর লক্ষণ কি? এখন প্রথমে সদ্‌গুরু বা জগদ্‌গুরু কে হবেন

তার উত্তরে শাস্ত্র বলছেন –

"তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয়ঃ উত্তমম্‌।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্‌।।"
(ভা:-১১/৩/২১)

আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তম শ্রেয়ঃ বস্তু অবগত হওয়ার জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করবেন যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রুতি শাস্ত্র সিদ্ধান্তে সুনিপুণ পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ অধোক্ষজ ভগবানের অনুভূতি ও দর্শন লাভ করেছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোন ক্ষোভের বশীভূত নয় তিনি সদ্‌গুরু বা জগদ্‌গুরু। এই প্রসঙ্গে শ্রীভক্তিসন্দর্ভে আছে ---

" শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত ব্যক্তিই সদ্‌গুরু। বেদে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠাকেই সদ্‌গুরু বলেছেন। নিরস্ত কুহক সত্য কোন অজ্ঞান দ্বারা আবরণ যোগ্য নহে। সেই নিরস্ত কুহক বাস্তব সত্য শ্রীকৃষ্ণ হতে ব্রহ্মার হৃদয়ে অভিব্যক্ত ছিল। ব্রহ্মা সেই অবিসংবাদিত সত্য নারদকে প্রদান করেন। শ্রীদেবর্ষি ইহা শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে দিয়েছেন। শ্রীব্যাস তা শ্রীআনন্দতীর্থকে দান করেন। ইহার অষ্টাদশ আধস্তনিক পরিচয়ে শ্রীগৌরসুন্দর তার নিজ-জনগণের স্বায়ত্তীকৃত ধনরূপে এই প্রপঞ্চে প্রকটিত করেছেন। প্রপঞ্চে কোন অজ্ঞান আবরণই তাকে পরিবর্তিত বা পরিবর্জিত করতে পারে না। ইহাই অবরোহবাদ বা শিষ্যপারম্পরা ক্রম। যেখানে ইহার বিপরীত ক্রমে গুরু নির্ণীত হয়েছে, সেস্থলে মর্ত্যবুদ্ধিতে গুরুদেবের প্রতি অসূয়া লক্ষিত হয়। যেখানে শ্রীগুরুর প্রসাদই শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ, সেখানেই ভক্তিলতা-বীজ দৃষ্ট হয়। আরোহবাদীর সম্বল প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি। আরোহবাদী অতিক্লেশে বাস্তব-সত্য নিরূপণ করতে গিয়ে গুরুদ্রোহি হয়। সুতরাং বিষ্ণু বা বৈষ্ণব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে অনুচিৎ স্নিগ্ধ শিষ্যকে অবিমিশ্র নিরস্তকুহক সত্য প্রদান করে।

যেখানে কাপট্য বা কুহক বর্তমান তথায় গুরু-শিষ্যের অভিনয়টি অধিরোহবাদাশ্রিত। তথায় বাস্তব-সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। পরমক্লেশে অর্জ্জিত প্রায় সত্যপ্রতিম উপলব্ধি গুরু নামধারি ও তচ্ছিষ্যকে অধঃপাতিত করে। সেখানে গুরু-শিষ্যের অভক্তি-পন্থা প্রবল। আরোহবাদীর ইন্দ্রিয় গুলি ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা দোষ চতুষ্টয়ে সর্বদাই দূষিত। শ্রীগুরুমুখে কীর্তন, শ্রবণকারির বাস্তব বস্তুর ধারণায় ঐগুলি নেই। 'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে' এটাই সদ্‌গুরু পাদাশ্রয়, নতুবা নিজ ভ্রমাদি দোষ চতুষ্টয় মাত্র সম্বল করে ভাগবত পড়তে গেলে কোন ফলই হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্ত সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। ভাগবত বিরোধী কৃত্রিম শারিরীক ভাষ্যকারগণ নিজ নিজ জড়াভিনিবেশ ক্রমে যে সকল সাম্প্রদায়িক মত সৃষ্টি করে ভগবদ্ ভক্তগণকে বিপদগামী করার প্রয়াস করেছেন তা কুহকাবৃত সত্য নামে পরিচিত হলেও প্রাকৃত ভোগী ও ত্যাগীর উপযোগী মাত্র। উহা আত্মার নিত্য বৃত্তি নহে, অনাত্মার মিশ্রবৃত্তি হতে উদ্ভূত জানতে হবে। উহাদের ক্রিয়া কলাপ প্রাকৃত স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূমিকায় অবস্থিত। অবৈষ্ণব-গণ বিষ্ণু মায়ায় প্রতারিত হয়ে ভজনীয় বস্তু বিষ্ণুকে ও বিষ্ণুভক্তিকে প্রাকৃত জ্ঞান করেন। আত্মবিদের সেরূপ দুঃসঙ্গ করার নিত্য বৃত্তি নেই।"

"শব্দব্রহ্ম প্রকাশই গুরুর গুরুত্ব। এইজন্য ব্যাসদেব অদ্বিতীয় অসমোর্দ্ধ জগদ্‌গুরু। শ্রীব্যাসদেবই শ্রীগুরুদেব । ব্যাস না হলে অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্মের বিস্তারকারী না হলে কেহ গুরু হতে পারেন না। শ্রীগুরুদেব স্বয়ং বাণীবিগ্রহ। তিনি নাম ব্রহ্মের শক্তি । শ্রীনাম শক্তি ব্যতীত অপর কেউ শ্রীনাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করতে পারেন না। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাওয়া মানে অপ্রাকৃত চৈতন্যবাণীর ও আম্নায় ধারার সন্ধান পাওয়া। ভগবানের মালিক গুরুদেব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুরুদেবের সম্পত্তি বা ধন। এজন্য গুরুই

ভগবান্‌কে দিতে পারেন। 'কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শকতি আছে।' শ্রীগুরুদেব শ্রীনামময় তনু। শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধ জ্ঞান প্রদাতা। অপ্রাকৃত শ্রীগুরুদেবে সুদৃঢ় বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, প্রীতিই ভক্তির মূল। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ। তিনি আত্মবিৎ-- কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ। তিনি চৈতন্যদেবের নিজজন। শ্রীগুরুদেব অভেদ বিচারে উপাস্য পরাকাষ্ঠা। তিনি ভগবান্ হয়েও ভগবদ্ প্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণুবিগ্রহ লীলার প্রকটকারিণী। শ্রীগুরুদেব ও কৃষ্ণ অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রকাশ তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব সেবক ভগবান্। তিনি মুকুন্দ প্রেষ্ঠ-রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি অভিন্ন বার্ষভানবীর প্রকাশ মূর্ত্তি। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব স্বরূপশক্তি হয়েও শ্রীকৃষ্ণ-শক্তিমান্। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ বা ভোক্তা আর শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রকৃতি বা কান্তা।"

শ্রীল প্রভুপাদ গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেছেন-- " শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার মূর্খতা, অজ্ঞতা, অসদ্‌বিচার প্রণালী,অস্থির সিদ্ধান্ত, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি ভক্তিহীন অসদ্‌বুদ্ধির দ্বারা আক্রান্ত আমার চিত্তের কথা- হৃদয়ের কথা পরিপূর্ণ মাত্রায় অভিজ্ঞ। কাজেই আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। যার নিকট উপস্থিতহলে অন্য কারোও কথা শোনার আবশ্যক হয় না। অন্য কারও কাছে যেতে হয় না-তিনিই সদ্‌গুরু। জগতের লোক আমার রুচির অনুকূলে কথা বলে আমাকে আকৃষ্ট করছে, আমার প্রিয় হতে চাইছে। কিন্তু যিনি আমাকে এভাবে দেহ-মন রূপ খোলসের উপকার না করে প্রকৃত আত্মার নিত্য বাস্তব মঙ্গল বিধান করতে চান, সত্য সত্যই আমার দুঃখে কাতর, আমার ব্যথায় ব্যথিত যিনি, সেই দরদী দয়াল পরমবান্ধব শ্রীগুরুদেব। শ্রীমদ্ভাগবত এই রকম নিত্যসিদ্ধ প্রেমিকশ্রেষ্ঠ গুরুদেবের কাছে শরণাগত হতে উপদেশ করছেন। আমার যা আছে সব ছেড়ে দিয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্তভাবে আশ্রয়

গ্রহণ করতে হবে। মদ্‌গুরু-জগদ্‌গুরু। মন্নাথ-জগন্নাথ। আমার গুরু সমগ্র জগতের গুরু। এইরকম শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদেরকে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান দান করতে পারেন। তখন জীবের ভক্তিচক্ষু, জ্ঞানচক্ষু, দিব্যচক্ষু, প্রেমচক্ষু লাভ হয়। সেই চক্ষুর দ্বারা শ্রীগুরুদেবের অপ্রাকৃত স্বরূপ জানা যায়। যিনি এই দিব্যচক্ষু দান করে জীবের অজ্ঞানতম অন্ধকার দূর করে প্রেমভক্তি রাজ্যে পরিচালিত করেন তিনি গুরুদেব। তিনি কৃপাপূর্বক জীবকে হরিনাম, মন্ত্র, উপদেশ প্রদান করেন। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেন, দুঃখীকে সুখী করেন। ভবরাজ্য থেকে ভগবৎ রাজ্যে নিয়ে শ্রীগৌর-কৃষ্ণের প্রেম সেবা দান করেন। সেইজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করা হয়---

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"

* * *

"জ্ঞানদাতা গুরুরূপে আমি ভগবান্।
উপদেশ করি আমি গুরুরূপ ধরি।
গুরু উপদেশে লোক যায় ভব তরি।।
গুরুকে সাক্ষাৎ যেন ঈশ্বর করি মানে।
সেই সে আমার প্রিয় সর্বতত্ত্ব জানে।।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সাক্ষাদ্ ভগবান্। তিনি আশ্রয় ভগবান্। স্বয়ং ভগবান্ অপাক্ষা তিনি কোন অংশেই ন্যূন নহেন। সেইজন্য শাস্ত্র বলেছেন শ্রীগুরুদেবই সাক্ষাৎ হরিদেব।

"গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বর।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা।।"

গুরু ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই শিব, গুরুই পরব্রহ্ম। এই বোধে সর্বদা সর্বক্ষণ, সর্বতোভাবে প্রীতি পূর্বক শ্রীগুরুদেবের বিশ্রম্ভ সেবা করতে হবে। তাছাড়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু বলেছেন- 'হরিরেব

গুরুঃ গুরুরেব হরিঃ। নাস্তি তত্ত্বং গুরু পরম্' হরিই গুরু, গুরুই হরি। গুরু অপেক্ষা অধিক সেব্য বা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর কিছু নেই। এজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা সর্বত্র সর্বদা চিন্তনীয়, কারণ গুরু কৃপা ও গুরুসেবা ব্যতীত ভক্তি হতেই পারে না। তাই গুরুনিষ্ঠ স্নিগ্ধ ভক্তগণ সুদৃঢ় বিশ্বাস, আদর ও প্রীতির সহিত নিরন্তর গুরুসেবা করে গুরু-কৃষ্ণের সুখবিধান করে থাকেন। বিশ্রম্ভ গুরু-সেবকগণ গুরুপাদপদ্মের সেবা চিন্তায় তন্ময় থেকে কি ভজনে, কি ভোজনে, কি শয়নে, কি জাগরণে, কি সর্বকালে অর্থাৎ জীবনে-মরণে, সম্পদে-বিপদে, দূরে-নিকটে, দিনে-রাত্রে, প্রভাতে-সন্ধ্যায়, সংকীর্তনে, মহাপ্রসাদ সেবনে, বিশ্রামে, সর্বাবস্থায় গুর্বানুগত্যে গুরু সেবা করে থাকেন। সেজন্য সাধক জীবের কাছে গুরুপাদপদ্ম সাক্ষাৎ হরি। তিনি জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয় এরূপ ভাবে সেবা করলে অচিরেই সাধক শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপ, নিজের স্বরূপ, নামের স্বরূপ, ধামের স্বরূপ, বিগ্রহের স্বরূপ জানতে পারে। তাই ভগবান্ পেতে হলে আগে চাই সদ্‌গুরু ও তাঁর আশ্রয়ে ও তাঁর আনুগত্যে ভজন জীবন গঠন করা। শ্রীভগবান্ বিষয় জাতীয়, আর গুরুদেব আশ্রয় জাতীয় ভগবান। তিনি সেব্য ভগবান্ আর গুরুদেব সেবক ভগবান্।

এছাড়া ও শ্রীগুরুদেবের আর একটা স্বরূপ আছে তিনি বলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দতত্ত্ব। এক স্বরূপে তিনি জীব উদ্ধার লীলা করে থাকেন। অন্যরূপে অনঙ্গ মঞ্জরী অর্থাৎ শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্ন কায়ব্যূহ। শ্রীকৃষ্ণের অদ্বিতীয় সেবাসুখ প্রদাতা শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা কিংকরী অর্থাৎ মঞ্জরী। শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপ যদি মঞ্জরী না হয় তবে তাঁরা জগদ্‌গুরুর কার্য করতে পারবেন না। জীবকে অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল প্রেমভক্তি দান করতে পারবেন না বা জীব উদ্ধার লীলা করতে পারবেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই স্বরূপ অত্যন্ত

নিগূঢ়। এই স্বরূপের কথা ভজনের উন্নত স্তরে বোঝা যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব প্রথমে শ্রীগুরুরূপ ধারণ করে জীবের কাছে ধরা দেন -সম্বন্ধ করেন, সেবা শিক্ষা দেন, ভজন শিক্ষা দেন ও সেবা গ্রহণ করে সিদ্ধদেহ দিয়ে গোলোকে নিয়ে যান। ভগবানের কৃপা শ্রীগুরুদেবের মধ্যে প্রকাশ পায়।

"গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণ।
গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণ।।"

তা ছাড়া শ্রীভাগবতে আছে–

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।।"

ভগবান্ উদ্ধবকে বলছেন,-- "হে উদ্ধব, গুরুদেবকে আমার স্বরূপ জানবে। গুরুতে সামান্য নর বুদ্ধিতে অসূয়া অর্থাৎ অনাদর করবে না। গুরুসর্বদেবময়। শ্রীভগবানই আচার্য্যরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। শ্রীমদাচার্য্যের আচরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নেই। তিনি সাক্ষাৎ আশ্রয় বিগ্রহ। যদি কেউ হরিসেবা বিমুখ হয়ে আচার্য্যত্বের অভিমান করে তাহলে তার সুদুরাচারকে কেউ সদাচার বলে গ্রহণ করবে না। আচার্য্যের অনন্য ভজনই তাঁর ভগবৎ প্রকাশত্বের পরিচয়। ভোগে অসন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্রিয় পরায়ণ ব্যক্তিগণ আচার্যের সুষ্ঠু আচরণে ঈর্ষা ও মাৎসর্য করেন। আচার্য্যদেব সেব্য ভগবানেব অভিন্নাঙ্গ, সুতরাং তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলে ভগবান্ ও তৎপরিকরের কৃপা হতে বঞ্চিত হতে হয় ও অবশেষে মর্ত্ত্যবুদ্ধি ফলে জন্মজন্ম কুম্ভিপাক নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

"গুরুরূপে জন্মদাতা প্রভু ভগবান্।
কভু না করিবে তাঁরে মানুষ গেয়ান।।
গুরুতে যাবৎ যার আছে নরবুদ্ধি।
তাবৎ না হয় তার কোন কার্য্য সিদ্ধি।।

সেই গুরু সেই হরি দেখিব সমান।
গুরুভক্তি করিয়া ভজিব মতিমান্।।"

গুরুদেব বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস হলেও শিষ্য অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে তাঁকে শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন প্রকাশ জানবে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীগুরুদেব স্বয়ং ভোগবান কৃষ্ণ নন। পরন্তু শাস্ত্রবিদ্গণ বলেন, শ্রীগুরু-কৃষ্ণে ভেদ ও অভেদ বর্ত্তমান। তাঁরা পরস্পর অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ গুরুপাদপদ্ম সম্বন্ধে বলেছেন, 'মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে গুরুবরং স্মর।' শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলেছেন,-'শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে' তদনুগ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগুরুদেব স্তোত্রে বলেছেন--"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন-সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।" অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব সাক্ষাৎ হরি বলে কীর্ত্তন করেছেন এবং সাধুগণ গুরুদেবকে হরি বলে জানেন। যিনি সদা প্রকাশ স্বরূপ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের প্রিয় সেবাধিকারী সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের সর্ব্বতোভাবে বন্দনা করি। সরল প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতি সমূহে ও শুদ্ধভজন গীতি গুলিতে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধাপ্রিয় সখী বা শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ প্রকাশ বলেছেন। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্যবাসী জীব নন। তিনি অমর বস্তু, নিত্য বস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য। আমরা তাঁর বশ্যতত্ত্ব আর তিনি আমাদের ঈশ্বরতত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব অনন্ত জীবন দাতা। তোমার ভবরোগের বৈদ্য। সর্বতোভাবে তোমার রক্ষক, পালক, উপকারক ও নিস্বার্থ বান্ধব। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই সকল সন্দেহ ও বাদ নিরসন করতে সমর্থ। তিনি মঙ্গলঠাকুর ও মঙ্গলদাতা এবং আমাদের একমাত্র মঙ্গলের আকর। শ্রীগুরুদেবই আমার একমাত্র বন্ধু, একমাত্র প্রাণপতি, একমাত্র জীবনদেবতা,

একমাত্র হৃদয়দেবতা ও নিত্য মংগলপ্রার্থী।

যারা আচার্য্যতত্ত্বে বা গুরুতত্ত্বে বা নিত্যানন্দতত্ত্বে শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট পূরণ ছাড়া অন্য কোন ইতর অভিলাষ আছে এরূপ মনে করে বা আশংকা করে তারা গুরুতত্ত্ব মুখে স্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে আচার্য্যবিদ্বেষী। যদি কোন অভিমানী ব্যক্তি ব্রহ্মা হতে বর্ত্তমান আগত আচার্য্য অর্থাৎ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গোস্বামী ঠাকুর পর্যন্ত্য আম্নায় বা ভাগবত গুরু-পরম্পরার মধ্যে কোন গুরু বা আচার্য্যের কৃষ্ণেতর অভিলাষ বা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব বিদ্বেষ জনিত পতনের সম্ভাবনা থাকতে পারে এরূপ ভাবনা বা কল্পনা বা সন্দেহ করে তবে তিনি কখনও নিজেকে শ্রীরূপানুগ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবক বলে পরিচয় দিতে পারেন না। তিনি অনর্থ যুক্ত সেবা বিমুখ ব্যক্তি বিশেষমাত্র। তার চর্মচক্ষু- মাংসদৃক্ নয়নে আচার্য্যের অতিমর্ত্ত্য লীলায় অপ্রাকৃত অনুভূতি আসে না। আধ্যক্ষিকতা তার বিচারের মাপকাঠি। সুতরাং গুরুপাদপদ্মে অপরাধের পাহাড় বা মর্ত্ত্যবুদ্ধি অবশ্যই আসবে। সেজন্য একমাত্র হরিসেবা প্রদানকারী গুরুপাদপদ্মকে হরিস্বরূপ জানতে হবে। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে পতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীরূপানুগ গুরু-বৈষ্ণবের শরণাগত নিষ্কপট সেবকমাত্রই শ্রীগুরুপরম্পরায় সকল গুরুপাদপদ্মে সমভাবযুক্ত দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত ও সতত দৃঢ়নিষ্ঠ।

যারা বলে গুরু ও আচার্য্য ভিন্ন তত্ত্ব। গুরু অপেক্ষা আচার্য্য ছোট, আচার্য্যকে দীক্ষাগুরুর সম্মান দেওয়া যেতে পারে না। দীক্ষাগুরু পাদপদ্মে শরণাগত,অনুগত ও দৃঢ়নিষ্ঠ থাকার ন্যায় প্রকটাচার্য্য পাদপদ্মে শরণাগত, অনুগত, দৃঢ়নিষ্ঠা থাকা শুদ্ধ ভক্তির কার্য্য নয়। অধিক ভক্তি প্রদর্শনের কার্য্যটা অতিবাড়ী- এরূপ বিচার পরায়ণ ব্যক্তিগণ গুরুতত্ত্ব বোঝে না। এমনকি ভক্তিরাজ্যের দ্বারেও প্রবেশ লাভ হয় নি। তারা গুরুত্ত্ব বা আচার্য্য তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের দয়ার তুলনা নেই সর্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁর প্রেমে বশীভূত, কৃষ্ণ যাঁকে স্কন্ধে ও মস্তকে রাখেন তিনি গুরুপাদপদ্ম। তাঁকে কখনও মর্ত্ত্যবুদ্ধি বা অসূয়া করবে না। শ্রদ্ধাহীন সাধারণ ব্যক্তির চোখে শ্রীগুরুপাদপদ্ম একরূপে পরিচিত আবার অন্তরঙ্গ ভক্তের কাছে সাক্ষাৎ প্রেমসেবা প্রদায়িনী শ্রীবার্ষভানবীরূপে প্রতিভাত।

ভক্তের কাছে শ্রীগুরুদেব আমার একমাত্র পরম প্রীত্যাস্পদ নিত্যসেব্য, জীবনসর্বস্ব, প্রাণকোটিসর্বস্ব বলে অনুভূত হয়। মানুষ দর্শন, চামড়া দর্শন গুরুদর্শন নয়। গুরু লঘু নয়, দেবতা নয়, তিনি ঈশ্বর নামাচার্য্য-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। এই শ্রীগুরুপাদপদ্ম অন্তরে চৈত্ত্যগুরু-রূপে ও বাইরে মহান্ত গুরুরূপে নিত্যকাল আমাদের ভজনপথে পরিচালিত করেন। অবশ্য শরণাগত ব্যক্তিকে চৈত্ত্যগুরু guide করেন।

"শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ।।
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতেগুরু চৈত্ত্য রূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে।।
(শ্রীচৈ: চ: আদি ১/৫৭-৫৮)

আমার গুরুদেব সেবক ভগবান হয়েও বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস। একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। তথাপি আমার গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ বলেই জানব। শিষ্যের কাছে গুরুদেব কৃষ্ণের বিহারস্থল। ভগবান্ জীবের অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে অবস্থান করেন আবার বাহিরে মহান্ত গুরুরূপে আবির্ভূত হন।

"নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ,
ব্রহ্মায়ুষোঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব,-

ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।।"

(ভাঃ- ১১/২৯/৬)

হে ঈশ! আপনি বহির্দ্দেশে মহান্তগুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে জীবগণের বিষয় বাসনা নিরাস করে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন । জীবের অন্তরে পরমাত্মারূপে নিত্যকাল আপনি আছেন। হে প্রভু, আপনি করুণাময়। জীবের প্রতি আপনার করুণার অন্ত নেই। জীবের হৃদয় মন্দিরে আসন পরিগ্রহ করে জীবকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। যারা আপনার নিষ্কপট করুণা ও আশীর্বাদ পেতে চায় ও নিষ্কপট শরণাগত, আপনি তাদেরকে সাক্ষাৎভাবে **guide** করেন। আর যারা আপনার কাছে কপটতা করে তারা আপনার কপট কৃপা পায়। তখন আপনি তাদের কর্মানুসারে তদুচিৎ ফল প্রদান করেন। জীবের শুভাশুভ কর্মফল প্রদানের জন আপনি প্রত্যেক জীব হৃদয়ে চৈত্ত্যগুরুরূপে বসে আছেন। এই চৈত্ত্যগুরুর অকপট বা নিষ্কপট কৃপা লাভ করতে পারে যারা তারা শুদ্ধ ভক্ত। তারা আপনার অহৈতুকী করুণার কথা স্মরণ করে পরমানন্দ সাগরে ভাসতে থাকে। এই সব ভক্তগণ তখন ব্রহ্মার মত আয়ু পেয়েও নানা যোগ্যতা দ্বারা আপনার উপকারের ঋণ শোধ করতে পারে না। যেহেতু ভগবান্ তাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে চৈত্ত্যগুরুরূপে মঙ্গল বিধান করেন এবং অভক্তির বিচার বিনাশ করেন। ভগবানের করুণা পরিশোধ করার শক্তি সুধীজীবগণ প্রচুর ভজন করেও লাভ করতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে চৈত্ত্যগুরুর কাজ কি? তাঁর কাজ হল সুকৃতিবান্ জীবকে ভগবদ্ উন্মুখ করে ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত করা। তিনি অন্তরে বসে আছেন জীবকে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। এছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হল চৈত্ত্যগুরুর নিষ্কপট কৃপায় জীব মহান্ত গুরুর সন্ধান পায়। এটাই তাঁর আসল কাজ। মহান্ত গুরুকে দেখিয়ে দেওয়া, তাঁর কাছে এনে দেওয়া, তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করানোই

চৈত্ত্যগুরুর কাজ। চৈত্ত্যগুরু যদি প্রেরণা না দেন বা না জানায় তবে জীব মহান্ত গুরুকে দেখেও চিনতে পারে না। মহান্ত গুরুকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি অন্তরে বসে আছেন। বস্তুতঃ চৈত্ত্যগুরু ও মহান্তগুরু একই। "জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে।।" শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁর দাসানুদাসগণ জীবের পারমার্থিক মঙ্গল লাভের জন্য মহান্ত গুরুরূপে এ জগতে অবতীর্ণ হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রথম শ্লোকে 'গুরূন্' শব্দে মন্ত্রদাতাগুরু ও শিক্ষাগুরুকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে অভিন্ন তত্ত্ব বলেছেন। তাছাড়া আদি লীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৩২সংখ্যায় 'গুরুদ্বয়' শব্দে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর কথা বলা হয়েছে। মন্ত্রগুরু ও দীক্ষাগুরু একজনই হয়। দীক্ষাগুরু কখনও অনেক হতে পারে না। কিন্তু শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরু বহু হতে পারেন। যেমন দীক্ষাগুরু মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামী ঠাকুর । কিন্তু শিক্ষাগুরু যথা শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়গোস্বাম্মী, কৃষ্ণদাস-লোকনাথ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-প্রভু পাদ-আচার্যদেব এঁরা সকলেই আমার শিক্ষাগুরু। যিনি শ্রীহরির প্রেমসেবা লাভের ভজন প্রণালী শিক্ষা দেন তিনি শিক্ষাগুরু। ভজনহীন দুরাচার অসদ্গুরু বা আচার্য হতে পারে না। ভজনানন্দী মহান্তগুরু এবং ভজনানুকূল বিবেকদাতা চৈত্ত্যগুরু ভেদে শিক্ষক দ্বিবিধ। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন--দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু উভয়েই অভিন্ন গুরুতত্ত্ব। দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর লীলাগত ভেদ থাকিলেও শিষ্যের কাছে উভয়েই সমপূজ্য ও সমতত্ত্ব। উভয়েই একই আশয়যুক্ত। একই আশয়, একই অভিপ্রায়, একই হৃদয়। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সুখবাসনাই তাঁদের একমাত্র অভিলাষ।

"শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ।।"

শ্রীগুরুতত্ত্ব চৈত্ত্যগুরু বা মহান্ত গুরু এই দুই লীলায় প্রকাশিত। চৈত্ত্যগুরুকে সকলে সহজে দেখতে পায় না বা তাঁর সেবা করতে পারে না। সহজে তাঁর আদেশ পেতে পারে না। সেই জন্য চৈত্ত্যগুরুর থেকে লীলা বৈশিষ্ট্য দেখানোর জন্য মহান্ত গুরুর অবতার। অন্তর্যামী শিক্ষাগুরুই চৈত্তগুরু এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরুই মহান্ত গুরু। যিনি বাইরে আমার নিত্য বাস্তব মঙ্গলের জন্য নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যরূপে আবির্ভূত তিনিই মহান্ত গুরু। এছাড়া মহান্ত গুরুর সেবকগণ বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুর কাজ করে থাকেন। শাস্ত্র শ্রবণ, সাধু মুখ নিঃসৃত ভগবৎ কথায় রুচি উৎপন্ন হলে জীব দিব্যজ্ঞান লাভের সুযোগ পায়। এখানে চৈত্ত্যগুরু জীবকে কৃপার তারতম্য নির্দ্দেশে শ্রৌত পথের উপকারীতা দেখায়। এই চৈত্ত্যগুরুর কৃপাছাড়া বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু, দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরুগণের পাদপদ্মের সেবা লাভের যোগ্যতা হয় না। কৃষ্ণ প্রসাদজ সুকৃতি হলে চৈত্ত্যগুরুর নিষ্কপট কৃপায় শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা জন্মে। শ্রৌত পন্থীই গুরু এবং শ্রৌতপথেই গুরুকে অবতরণ করতে হয়। তার্কিক, অন্যাভিলাষী কখনও গুরু হতে পারে না বা তর্কের দ্বারা কখনও গুরুকে জানা যায় না। যারা পারমার্থিকতা বা বৈষ্ণবতার পোষাক পরে আধ্যক্ষিকতা ও গণমতের খিদ্‌মত করে, লোকরঞ্জন করে, তারা মহান্ত গুরু পাদপদ্মের আনুগত্যরূপ একমাত্র অদ্বিতীয় অপরিহার্য শুদ্ধভক্তিপথকে 'গদিনসিন্ মহান্তগিরি' প্রভৃতি বলে ধোঁকা দিয়ে গণমতের পূজা করতে প্রবৃত্ত হয়। লোককে ধোঁকা দিতে পারে কিন্তু তাতে বাস্তব সত্য কখনও বিপর্যস্ত হয় না। মহান্তগিরি বা মোহান্তগিরির মূল উৎপাটনের জন্যই আচার প্রচার পরায়ণ অসমোর্দ্ধ মহান্ত গুরুর পাদপদ্ম যুগে যুগে জগতে অবতীর্ণ হন। এই ধারা বা প্রবাহ কখনও রুদ্ধ হবে না। পৃথিবী কোন সময়েই অপ্রাকৃত মহান্তগুরু পাদপদ্মের নিত্য আবির্ভাব থেকে বঞ্চিত হবে না। এটাই পরম করুণাময় ভগবানের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করুণার

নিদর্শন।

মহান্তগুরুও জগদ্‌গুরু। প্রকটাচার্য্য পূর্বাচার্য্যের বা জগদ্‌গুরুর প্রকাশ বিগ্রহ। তিনি জগদ্‌গুরুর কথাই গুরু-পারম্পর্যে প্রাপ্ত হয়ে আমাদের কাছে ভাগবত বাণী শোনান। তিনি কোন প্রকার বঞ্চক নন। আমার তোযামদকারী নন। আমার নিকট কোন জাগতিক বস্তু প্রার্থী নন। তিনি নিরপেক্ষ বাস্তব সত্যের বার্ত্তবহনকারী। শ্রীগুরুদেব সেবাবিগ্রহ বা ভক্তিবিগ্রহ। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণময়। সতত কৃষ্ণসেবা চিন্তায় বিভোর। শ্রীগুরুদেবের নাম, রূপ, গুণ, লীলা সবই সেবাময়। সেব্য ভগবানের সেবাই তাঁর সত্ত্বা, তাঁর স্বরূপ। তিনি প্রেমসেবায় সুদক্ষ এবং প্রেমভক্তিময় সেবা শিক্ষক। শ্রীগুরুদেব ভবপারের কর্ণধার বা নাবিক , তিনি নামপ্রেম দাতা ও ভক্তিপথ প্রদর্শক। তিনি নামাচার্য্য ও সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকায় 'আচার্য্য' সম্বন্ধে বলেছেন যিনি স্বয়ং আচরণ করে শিক্ষা দেন তিনিই আচার্য্য। যথা বায়ু পুরাণে-

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে স যস্মাদাচার্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ।।"

এই পদের যথার্থ মূর্ত্ত বিগ্রহ রূপে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আসেন। তিনি শাস্ত্রের অর্থসমূহ সম্পূর্ণরূপে মন্থন করে নিজে আচরণ করেন এবং সকলকে সেই আচরণে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন তিনিই আচার্য্য নামে কথিত হন। আবার-

"আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার ।
প্রচার করেন কেহ না করে আচার।।
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য।
তুমি সর্বগুরু, তুমি জগতের আর্য।।"

কারও ক্রিয়ানৈপুণ্য বিষয়বুদ্ধি কার্য নির্বাহ ও পরিচালন ক্ষমতা, লোকতোষণ বা লোকরঞ্জন ক্ষমতা দেখে কি আচার্য্য নিরূপণ হয়?

তদুত্তরে শাস্ত্র বলেছেন-

" কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।।
কিবা বর্ণী, কিবা শ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রম হীন।
কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা যেই, সেই আচার্য্য প্রবীণ।।"

শ্রীভক্তি সিদ্ধান্তবাণী-বিগ্রহই আচার্য্য। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণকে লাভ করেছেন। কৃষ্ণ যাঁর সঙ্গে নিত্য বিলাস করেন, যাঁর হৃদয় মন্দিরে গোবিন্দ বিশ্রাম করেন। কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছুই জানেন না। আবার কৃষ্ণ তাঁকে ছাড়া অন্য কিছু জানে না। সেই ব্যক্তি কৃষ্ণ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞ। " কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শকতি আছে।" সেই ব্যক্তিই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা। যিনি আচার্য্য তিনি কৃষ্ণ করুণাশক্তি। কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত জীব উদ্ধার লীলা, জীবকে ভগবদ্ধামে নিয়ে যেতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, "আজকাল আচার্য্যের কাজটা এখন ব্যবসাদারীতে পরিণত হ'য়েছে – গুরুর নাম নিয়ে শিষ্যের গোলামী করছে। যে নিরেপেক্ষ নয়, যে বাস্তব সত্যের কথা কীর্ত্তন করতে পারে না, সেরূপ অনন্তকোটি বক্তা নরকে চলে যাবে; কিন্তু নির্ভীক হয়ে যে নিরপেক্ষ সত্যকথা কীর্ত্তন করে থাকেন সেই কথা শত শত-জন্ম-পরেও – শত শত যুগ পরেও কেউ না কেউ এটার নিগূঢ় সত্য বুঝতে পারবে। যিনি আমাকে প্রতি পদে-পদে কি করে কৃষ্ণসেবা করতে হয়, কি করে আশ্রয়জাতীয় ও বিষয়-জাতীয়ের সেবা করতে হয়, এটি শিক্ষা দেন, সর্ব্বদা অনুকূল বিষয়গুলি জানিয়ে দেন তিনিই গুরুদেব। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। ভগবানের যাবতীয় প্রিয়তমগণের মধ্যে আমার মঙ্গলদাতা গুরুদেব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়তম। তিনি কি করে ২৪ঘন্টার মধ্যে ২৪ ঘন্টা সর্বেন্দ্রিয়ে ভগবানের সেবা করতে হয় তাই শিক্ষা দেন।"

জগদ্‌গুরু কে হবেন-তা আমরা কি করে জানবো? আর কেই বা আচার্য হবার যোগ্য? আমরা মনগড়া কথা বলবো না। শ্রীগুরুবর্গ যে বাণী কীর্ত্তন করেছেন তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ করছি। মূর্খ না পণ্ডিত, ধনী না দরিদ্র, ভোগী না ত্যাগী, গৃহী না সন্ন্যাসী, শূদ্র না ব্রাহ্মণ, স্ত্রী না পুরুষ, বালক না বৃদ্ধ -- এসবের মধ্যে কে আচার্য পদের উপযুক্ত? ভক্তি শাস্ত্র বলেন,- এরূপ বিশেষণে চিহ্নিত ব্যক্তি কেউই আচার্য হবার যোগ্য নয়। তবে কি ক্রিয়া নিপুণ ব্যক্তি আচার্য হবে? অথবা আত্মেন্দ্রিয় তর্পণকারী ব্যক্তি আচার্য হবে? শাস্ত্র বলছেন -'যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, ভক্তি সিদ্ধান্তে নিপুণ, শব্দব্রহ্মে ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণকারী ব্যক্তিই আচার্য হবার যোগ্য। যিনি হ্লাদিনী শক্তির দূত হয়ে এখানে আসেন, তিনি আচার্যের কাজ করতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ কারী কৃষ্ণৈক-শরণত্ব বা অনন্য ভজনই আচার্যের আচার্যত্বের পরিচায়ক। অর্থাৎ যিনি আচার্য হবেন তিনি বিপ্র হোক, সন্ন্যাসী হোক, ব্রহ্মচারী হোক, গৃহস্থ হোক, মূর্খই হোক তিনি যদি কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অর্থাৎ কৃষ্ণের সাক্ষাৎ অনুভূতি আছে তবে তিনি আচার্য হবেন। আবার অগাধ পাণ্ডিত্য, যশ, শ্রী, যোগ্যতা ইত্যাদি প্রভাব প্রতিপত্তি আছে অথচ তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এরূপ ব্যক্তিও কখনো গুরু হতে পারে না। আগে দেখতে হবে তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ কি না। মহাজনগণের বাণীতে জানা যায় শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের আজ্ঞায় আচার্য নির্দিষ্ট হয়। কতকগুলি ভোগী, কামী রিপুতাড়িত ব্যক্তিগণের দ্বারা নির্বাচিত জাগতিক যোগ্যতা কর্মাধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি কখন আচার্যপদ অলংকৃত করতে পারে না। ভোটের দ্বারা কখনও গুরু নির্বাচন হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যাঁকে তাঁর পরবর্তী আচার্যরূপে চিহ্নিত বা আদেশ করেন অথবা তাঁর প্রেমসম্পত্তির ভাণ্ডার বা চাবিকাঠিটা যাঁকে দিয়ে থাকেন কেবলমাত্র তিনিই আচার্য

আসনে বসবেন। তাঁর জাগতিক যোগ্যতা নাও থাকতে পারে, তিনি গ্রন্থ পড়তে নাও পারেন, তাঁর সুন্দর ভাষা জ্ঞান নাও থাকতে পারে তিনি অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ বা 'দৃষ্টৈ স্বভাবজনিতৈ' ধর্ম থাকতে পারে, গায়ে কণ্ডুরসা থাকতে পারে, বক্তৃতার ফুল ঝুরি তাঁর নাও থাকতে পারে তবু তিনি অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই জগদ্‌গুরুর পদ অলংকৃত করবেন, আচার্যের সবচেয়ে বড় লক্ষণ তিনি সম্পদে, বিপদে, দুঃখে, সুখে শোকে , জীবনে, মরণে একমাত্র কৃষ্ণৈকশরণ। তিনি সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গীণ সুখবিধান করেন। তিনি বাহ্যাবেশে ব্রহ্মচারী, লালকাপড়,সন্ন্যাসী, গৃহস্থ যে কোন অবস্থায় থাকতে পারেন। কখনও রাজ অট্টালিকায় সুরম্য প্রাসাদে থাকতে পারেন, আবার কখনও শ্রীরূপ-রঘুনাথের আদর্শে অনিকেতন হয়ে গাছতলায় থাকতে পারেন--তথাপি তিনি মহাভাগবত পরমহংস ও আচার্যবর্য। মহাভাগবতোত্তমই গুরু। যাঁর সর্বত্র গুরুদর্শন সেই মহাভাগবতই গুরুর কার্য করতে পারেন।

তিনি লঘুকে গুরু, বহির্ম্মুখকে কৃষ্ণোন্মুখ করতে পারেন। সকলকে কৃষ্ণ ভক্ত করতে পারেন। তিনি 'বিন্দু মধ্যে মহাপ্রেমসিন্ধু সঞ্চারণে সুসক্ষম'। এরূপ ব্যক্তি গুরুর কার্য করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁর নিজের গুরু অভিমান আসে না। জগদ্‌গুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে অপ্রাকৃত রসিক কবিকুল চূড়ামণি শ্রীলরূপ গোস্বামিপাদ বলেছেন–জগদ্‌গুরু হবেন নির্গুণ অর্থাৎ রজঃ ও তমঃ উদ্ভূত কোন গুণ তাঁর মধ্যে থাকবে না। প্রাকৃত জাগতিক কোন গুণ নেই কিন্তু তিনি গোলোকের দিব্য অপ্রাকৃত সদ্‌গুণে বিভূষিত। তিনি ষড়বেগ জয়ী।

"বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং।
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেতধীরঃ।
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।।"

এই শ্লোকের মূর্ত্তবিগ্রহ না হলে জগদ্গুরু হয় না। কেবলাভক্তি সাধকেরও এসব গুণ না থাকলে প্রেম লাভ হবে না। বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ, ও উপস্থের বেগ এই ছয়টি বেগ যিনি বিশেষভাবে জয় করেছেন তিনিই এই নিখিল পৃথিবী শাসন করতে পারেন। এই গুণগুলির একটি কম হলে তিনি জগদ্গুরুর কার্য্য করতে পারবেন না। প্রাকৃত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ তাঁকে বশীভূত করতে পারে না। তিনি প্রাকৃত গুণহীন হলেও নানাবিধ সদ্গুণে বিরাজিত ও উদ্ভাসিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে সমস্ত অপ্রাকৃত গুণের মালিক তদ্ভক্তও দাসাধিকার সূত্রে সেই সেই গুণে বিভূষিত।

"সর্ব মহান্ত গুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে।।"

* * *

"গৌরবার্থ- দর্পহীন রসময়-রসিকং।
শুদ্ধসত্ত্ব চিত্ত সদা প্রেমে অংগ পুলকং।।
করুণেশ কৃপানিধি কাম-ক্রোধ বিহীনং।
বন্দে হরের্ভক্তগণং সর্বগুণ ভাজনং।।"

* * *

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা।
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।।"

এছাড়াও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বর্ণিত আছে, ---

" আশ্রমী ক্রোধ রহিতো বেদবিৎ সর্বশাস্ত্রবিৎ।।
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।
শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্বভূতহিতে রতঃ।।
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ।
সগুণোঽর্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ।।

নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ।
উহাপোহ প্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্ গরিমা নিধি।।"

বিষ্ণুস্মৃতৌ--

"কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্বসত্ত্বোপকারকঃ।।
নিস্পৃহঃ সর্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ববিদ্যাবিশারদঃ ।
সর্বসংশয় সংছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ।।"

যিনি আশ্রয়যুক্ত, ক্রোধশূন্য, বেদজ্ঞ, সর্বশাস্ত্রবিৎ, শ্রদ্ধাশালী, অসূয়ারহিত, মিষ্টভাষী, প্রিয়দর্শন, শুচি, সুবেশ, প্রাণীগণের মংগল সাধনে তৎপর, বুদ্ধিমান, স্থিরবুদ্ধি, বাঞ্ছারহিত, হিংসাশূন্য, বিবেচনাশীল, বাৎসল্যাদি গুণ- যুক্ত, ভগবৎ প্রতিমা সমূহের পূজায় কৃতনিশ্চয়, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ, হোমমন্ত্র পরায়ণ, তর্ক-বিতর্কের প্রকারবিদ্ এবং পবিত্র চিত্ত ও কৃপার নিলয় ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত গুরু গরিমার নিধান।

আরও বিষ্ণুস্মৃতিতে যিনি কৃপাসিন্ধু, পরম দয়ালুতা প্রযুক্তই জনকল্যাণ সাধনে তৎপর, সমস্ত গুণ পরিপূর্ণ, সকল প্রাণীর উপকারক, স্পৃহা রহিত, সকল বিষয়ে সিদ্ধ, সর্ব বিদ্যায় বিশারদ, সকল সংশয় ছেদন কর্তা এবং আলস্য শূন্য--তিনিই গুরু বলে কথিত। শুধু তাই নয় যিনি শিষ্যকে সমস্ত অমংগলের হাত থেকে উদ্ধার করে নিত্যমংগল শ্রীকৃষ্ণ ভজনে প্রবেশ করান, যিনি শিষ্যের অনর্থরাশি দূর করে শ্রীকৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে নিয়ে যেতে সমর্থ, যিনি শিষ্যের একজন্মের মংগল বিধান বা কামনা করেন না পরন্তু নিত্যবাস্তব মঙ্গল বিধান করেন তিনিই শ্রীগুরুদেব। গুরুদেব অর্থাৎ জগতের সকলের গুরু। শ্রীগুরুদেবের শিষ্যের প্রতি এই যে বাৎসল্য তা কোন হেতুমূলে জাত নয়। তাঁর করুণা অহৈতুকী স্বৈরিণী করুণা। 'অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার'। তিনি শিষ্যের কাছে যশঃ

প্রতিষ্ঠা কিংবা বিত্ত সম্পত্তি লাভের জন্য শিষ্যকে করুণা করেন না। এ জগতে শিষ্যের ভব সংসার ত্রিতাপ জ্বালা দূর করতে কেউ পারে না।

"গুরুবোঃ বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি, শিষ্যসন্তাপহারকাঃ।।"

শিষ্যের বিত্ত অর্থাৎ ধনাপহারক বহু গুরু জগতে আছে কিন্তু শিষ্যের সন্তাপনাশক সদ্গুরু জগতে দুর্লভ। শিষ্যের বাস্তব মঙ্গলের দিকে তাদের কোন দৃষ্টি থাকে না। শিষ্য ভজনরাজ্যে কতদূর উন্নত হলো সেদিকে লক্ষ্য নেই অথচ শিষ্যের কাছে টাকা -পয়সা সম্পত্তি, লাভ-পূজা- প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী। তিনি নিজের বাস্তব মঙ্গল লাভ করেন নি তাই শিষ্যের মঙ্গল কি করে করবেন। যিনি শিষ্যের জন্ম জন্মের সন্তাপ দূর করতে পারেন তিনি জগদ্গুরু পদবাচ্য।

"যো মন্ত্র ঃ সো গুরুঃ সাক্ষাদ্ যো গুরুঃ সো হরি স্বয়ম্ ।
গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্।।"

মন্ত্র , গুরু ও হরি একই বস্তু। তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। মন্ত্র সাক্ষাৎ গুরু। গুরু সাক্ষাৎ হরি। এজন্য যার প্রতি গুরু প্রসন্ন হন তার প্রতি শ্রীহরি স্বতঃই প্রসন্ন হন। স্বয়ং ভগবান্ ও গুরুদেবের মধ্যে পার্থক্য হল শ্রীগুরুদেব আশ্রয় জাতীয় সেবক ভগবান্ আর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভোক্তাভগবান্ বিষয়জাতীয় সেব্য ভগবান্। শ্রীগুরুদেব হরি বটে কিন্তু তিনি রাধারাণীর হরি নন। জীবের কাছে গুরুতত্ত্বের বা গুরুমহিমা বা গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণের এত প্রয়োজনের কারণ শ্রীগুরুদেবই জীবকে ভক্তিচক্ষু, প্রেমচক্ষু দেন, এবং দিব্যদেহ দান করেন। দু'দিনের মা, বাবা, ভাই, বোন, রাষ্ট্রপতি, কৌলিক গুরু এমনকি অযোধ্যা- দ্বারকা-মথুরার গুরুগণও এসব দান করতে পারবে না। একমাত্র ভগবৎ প্রেরিত সদ্গুরুর এতবড় অলৌকিক ক্ষমতা। তা অত্যাশ্চর্য ও অত্যদ্ভুত। আচার্যত্ব হল হ্লাদিনী

'শক্তি বা মূল আশ্রয় বিগ্রহের কৃপা শক্তি সঞ্চারিত একটি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার বিশেষ। আচার্যকে কেউ গঠন, সংশোধন, অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। গুরু বা আচার্যের শিষ্য অভিমানকারী মাত্রেই কখনও সম্প্রদায়ের সংরক্ষক বা আচার্য হতে পারে না। আচার্যের আচার্যত্বের যে সমস্ত সিদ্ধ বৈশিষ্ট্য আছে. তা তিনি কৃপা পূর্বক প্রকাশ করলেই একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসুগণ আচার্যের কৃপা-লোকেই আচার্যের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ দেখতে পায়। শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ দুই রূপে আমরা শাস্ত্রে জানতে পারি। এক শ্রীনিত্যানন্দভিন্ন তত্ত্ব, দুই শ্রীমতি রাধারাণীর অভিন্ন কায়ব্যূহ সেবা কুশলী নিত্য মঞ্জরী। গুরুপাদপদ্মের এই দুই স্বরূপের পরিচয় আমরা এখানে আলোচনা করছি। শ্রীগুরুদেব আমাদের কাছে নিত্য উপাস্য তত্ত্ব। লক্ষণ-বলদেব-নিত্যানন্দ একই তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ লীলার বলদেবই গৌরলীলায় নিত্যানন্দ হয়ে এসেছেন। বর্তমান যুগে আমরা লক্ষণ বলদেব বা নিত্যানন্দ কে পাছি না। কারণ তাঁরা ত' প্রকট লীলা করছেন না। সেই কানাই-বলাই কিংবা গৌর-নিতাই বর্তমান কিরূপে প্রকট আছেন? শাস্ত্র বলছেন-" তিনি গুরু রূপে নিত্যকাল এ ধরাধামে বিরাজমান আছেন। বলদেব- নিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব। বলরাম গুরুতত্ত্ব এবং নিত্যানন্দও গুরুতত্ত্ব। নিত্যানন্দ জগদ্গুরু, তাঁর কায়ব্যূহই শ্রীগুরুদেব। প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বে তিনি প্রকাশিত ছিলেন আর আজ নেই--এমন কখনও হয় না। যদি কেউ এই গুরুরূপী নিতাই ঠাকুরের দর্শন পায় তবে তার জীবন ধন্য ও সার্থক। সেই নিতাই ঠাকুর আজ অন্য নাম, অন্য চেহারা, অন্য বেশ ও অন্য ভংগী নিয়ে আবির্ভূত। বর্তমান প্রকট গুরুদেবও নিতাই ঠাকুরের মতই পতিতজনার বন্ধু। নিতাই ঠাকুর যেমন ভক্তির গুরু ও প্রেমের গুরু, গুরুদেবও তেমনি নিত্যানন্দ শক্তি বলে তিনিও প্রেমভক্তির গুরু। যে যথার্থ সদ্গুরু পায় সে নিত্যানন্দ শক্তি

কে পায়। ভাগ্যবান ব্যক্তিরা যথার্থ গুরুর যথার্থ দর্শন পায়। শ্রীগুরুদেব বাস্তব বস্তু। তিনি কৃষ্ণশক্তি ও গৌরশক্তি। শ্রীহরিঠাকুরের বৈভব শ্রীগুরুদেব। তিনি ভক্তির গুরুদেব, প্রেমের গুরুদেব। শ্রীগুরুদেবকে পাওয়া হল-শ্রীবলদেবকে পাওয়া হল।” (শ্রীল গুরুমহারাজের হরিকথা ৫ম খণ্ড)

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আর একটি স্বরূপ হল তিনি অভিন্ন শ্রীবার্ষভানবী। শ্রীরাধাঠাকুরাণী মূল আশ্রয় বিগ্রহ। তিনি মধুর রসের আচার্য শিরোমণি। শ্রীবার্ষভানবী কৃষ্ণকান্তা মুকুটমণি। মধুর রসের আচার্য মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীরাধার প্রিয়সখী নিত্যসিদ্ধ ব্রজগোপী। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ‘গুরুরূপা সখী বামে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে’ প্রভৃতি বাক্য আলোচনা করলে জানাযায় যে, শ্রীগুরু বা সখী শ্রীবার্ষভানবীর কায়ব্যূহ এবং তা হতে অভিন্ন। শ্রীগুরুদেব নামাচার্য। নামসংকীর্তনকারী শ্রীবার্ষভানবীর নিজজনগণ সকলেই আশ্রয়জাতীয় গুরুপাদপদ্ম এবং শ্রীরাধার অভিন্ন তত্ত্ব। এটা তাঁর নিত্য কিশোরী স্বরূপ। শ্রীগুরুদেব আশ্রয় তত্ত্ব হলেও বিষয় জাতীয় তত্ত্বের অপূর্ব সমাবেশ। কারণ শ্রীবলদেব প্রভুতে বিষয় ও আশ্রয় জাতীয় তত্ত্বের অপূর্ব অদ্ভুত সংমিশ্রণের সমাবেশ। সেইজন্য শ্রীগুরু পাদপদ্মকে পাঁচ প্রকারের সম্বন্ধ দ্বারা সেবা করা যায়। যারা মধুর রতিতে ভগবৎ ভজন করেন তারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অভিন্ন বার্ষভানবী বলে জানেন। যাঁরা বাৎসল্যরসের প্রার্থী তারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে নন্দ-যশোদাদির প্রকাশ বলে জানেন। যারা সখ্য রসের প্রার্থী তারা শ্রীদাম- সুদাম প্রভৃতি কৃষ্ণসখা ও তাঁদের প্রভু বলদেবের প্রকাশ বিশেষ বলে জানেন। যারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে দাস্য ভাবে সেবা করেন তারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে রক্তক-পত্রক বলে জানেন। আর যারা শান্তরসের সেবক তাঁরা শ্রীগুরুদেবকে যমুনা-নীর-গো-বেত্র-বেণু- বিষাণ প্রভৃতির প্রকাশ বলে জানেন। কেউ যেন

শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মূল আশ্রয় বিগ্রহ বা বিষয় বিগ্রহ বলে মনে না করেন।

শ্রীগুরু পাদপদ্মের সর্বশ্রেষ্ঠ দান বিপ্রলম্ভ নাম ভজন। যিনি মাদৃশ অযোগ্যকে কৃপা করে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, যাঁর কৃপায় শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের দয়া লাভ করেছি, যিনি নামের শ্রেষ্ঠতা জগতকে জানিয়েছেন, যিনি নাম ভজনের উন্নতির জন্য মন্ত্র-দীক্ষাদির দ্বারা আমাকে পবিত্র করেছেন। যাঁর কৃপায় আমি শ্রীচৈতন্যদেবকে ও তাঁর দ্বিতীয় স্বরূপ গৌড়ীয়ের একমাত্র মালিক স্বরূপ-দামোদরকে পেয়েছি, যাঁর কৃপায় শ্রীরূপগোস্বামীর সুশোভন চরণকমলকে পেয়েছি, যাঁর কৃপায় শ্রীসনাতন গোস্বামী, মধুপুরী, গোষ্ঠবাটী, রাধাকুণ্ড, গোবর্ধন পেয়েছি, আমি সেই গুরুপাদপদ্মকে কায়-মন-বাক্যে প্রণাম করি। যিনি সেই নাম ভজনের আচার্য, যিনি প্রেমভক্তির কথা জানিযেছেন– যাঁর কাছে গেলে মাধুর্যের ও ঔদার্যের ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁর জন্মভূমি গংগাতীর, শ্রীবাসঅঙ্গন এবং যাঁর কৃপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ ভূমি শ্রীক্ষেত্রধাম, জগন্নাথ দর্শন, গম্ভীরা পেয়েছি । সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।

“নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্রস্বরূপং
শ্রীরূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো শ্রীরাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত কৃপয়া-শ্রীগুরুং ত্বং নতোঽস্মি।।”

* * *

“ জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
বিরমিতনিজধর্মধ্যান পূজাদি যত্নং।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।।”

যিনি মাদৃশ বদ্ধজীবকে এত কিছু দান করতে পারেন। তাঁর

সেবাই আমাদের একমাত্র ধর্ম, একমাত্র কর্ম, একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র ব্রত, একমাত্র তপস্যা। ভগবানকে আমরা এই প্রাকৃত জ্ঞান দ্বারা পেতে পারি না। কিন্তু যাঁর কৃপায় সেই অধোক্ষজ ভগবানের দর্শন স্পর্শন সেবাদি পাওয়া যায়, তাঁর ধামে যাওয়া যায় সেই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের পূজা প্রতিবর্ষ প্রারম্ভে, প্রতি মাস প্রারম্ভে, প্রতি দিবসে, প্রতি মিনিটে, প্রতি মুহূর্তে করা একমাত্র কর্তব্য-একমাত্র কর্তব্য-একমাত্র কর্তব্য। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার কথা পরে আমরা কিছু আলোচনা করব। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাদ্ ভগবান্ অর্থাৎ সেবক ভগবান। গুরুরূপী ভগবান কি মনুষ্য, কি দেবতা, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি চণ্ডাল, কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত সকলেরই একমাত্র আশ্রয়নীয়। শ্রীগুরুদেব সমস্ত তীর্থেরও আশ্রয় স্বরূপ অর্থাৎ তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত তীর্থ বিরাজিত। সকল ঐশ্বর্য ও সকল প্রতিষ্ঠা শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিরাজিত। সেইজন্য শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবা করলে শ্রীগুরুদেবকে ভক্তি করলে সমস্ত তীর্থের ফল, সকল শাস্ত্রের মর্ম, সমস্ত জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, পাণ্ডিত্য সকলই করায়ত্ত হন। শাস্ত্রে শ্রীহরিদেবের অগ্রেই শ্রীগুরুদেবের সেবাপূজা নির্দিষ্ট হয়েছে। শ্রীশিবজী পার্বতীকে বলছেন—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।।"

হে দেবি! দেবপূজা, পিতৃপূজা প্রভৃতি সমস্ত আরাধনা অপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা ভক্ত-শিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা আরও শ্রেষ্ঠতম। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ এরূপ বলেছেন, সেব্য ভগবানের সেবা অনেক সময় সেব্যের নিকটে নাও পৌছাতে পারে কিন্তু সেবক ভগবানের সেবাদ্বারে অর্থাৎ গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণের যে সেবা সেই সেবা অব্যর্থ; তা ভগবানের শ্রীচরণে না পৌছে থাকতে

পারে না।' কারণ শ্রীগুরুদেব ভোক্তা ভগবান নন। তিনি শিষ্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করে তাঁর নিত্যপ্রভুর কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন।

তিনি আরও বলেছেন যারা ভগবানকে চায় তারা প্রথমেই সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করবেন এটাই শাস্ত্রের উপদেশ। সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত। সেই ভগবদ্ ভক্তের অগ্রণী হলেন আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁর সেবা করেন, ভগবান যাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন, যাঁর প্রেমে বশীভূত হয়ে তিনি গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধাম ছেড়ে ভক্ত সঙ্গে অবস্থান করেন, যাঁকে কোলে রাখবেন, কি কান্ধে রাখবেন, কি মস্তকে রাখবেন ঠিক করতে পারেন না। যাঁর প্রেম-ডোঁরে ভগবান চিরবন্দী হন—সেই গুরুদেবকে প্রাণ উজাড় করে সেবা করা ও ভালোবাসা আমাদের একমাত্র কর্তব্য, একমাত্র ধর্ম, একমাত্র ব্রত, একমাত্র তপস্যা, একমাত্র জীবন ধারণের উদ্দেশ্য। ভগবৎ দর্শনে বা ভগবৎ ভজনে শ্রীগুরুর কৃপাই মূল। সেই কৃপা লাভের একমাত্র উপায় নিষ্কপটভাবে প্রীতি-পূর্ণ হৃদয় উজাড় করে বিশ্রম্ভ গুরু সেবা করতে হবে। শিষ্যের কাছে গুরুদেব জীবনের-জীবন, প্রাণের-প্রাণ, হৃদয়ের-ধন, পরাণমণি, পরশমণি, শ্রীগুরুদেব জীবের সর্বস্ব, শ্রীগুরুদেবই একমাত্র জীবের নিঃস্বার্থ বন্ধু।

"জ্ঞানপ্রদাদ গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তি।
অতত্রব তদ্ভজনাদধিকো ধর্মশ্চ নাস্তি।।"

ভগবৎ জ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব অপেক্ষা জীবের অধিক সেব্য আর কেউ নেই। এজন্য শ্রীগুরুদেবের সেবা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠধর্ম কিছুই নেই। ভগবৎ ধামে গমন, ভগবৎ সেবালাভ, ভগবৎ দর্শন-স্পর্শন আলাপাদির জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় একান্ত দরকার। শ্রীগুরুদেব ছাড়া আমরা একাকী ভগবানের সাক্ষাৎকার বা তাঁর সেবা

পেতে পারি না। যেমন একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে বলি, যিনি কলিকাতা দর্শন করেছেন, যিনি তাঁর সম্বন্ধে বিজ্ঞ তিনিই কলিকাতার পুংখানুপুংখ সঠিকভাবে খবর বলতে পারেন; তদ্রূপ যিনি ভগবদ্ তত্ত্বজ্ঞ ভগবৎ দ্রষ্টা পুরুষ তিনিই ভগবানের কাছে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ বা পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন, তিনি শ্রীভগবানের মধুময় সেবা দান করতে পারেন। এজন্য আমাদের মতো মর্ত্ত্যবাসি জীবের কাছে শ্রীগুরুপাদপদ্মের এত প্রয়োজনীয়তা। মোট কথা অন্ধের যেমন লাঠি সম্বল তেমনি জীবের শ্রীগুরুদেবই সম্বল। তাঁকে ছাড়া জীব এক মুহূর্ত নিঃশ্বাস ফেলতে বা নিতে পারে না। এমন কি এক পাও হাঁটতে পারে না । তাই ভূতলবাসী জীবের কাছে শ্রীগুরুদেবই প্রাণ। প্রাণ ছাড়া যেমন দেহ মূল্যহীন, তেমনি তিনি ছাড়া জীবন উষর মরুভূমি। জগদ্গুরু শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলেছেন- নিখিল ভক্ত্যংগের মধ্যে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যংগ গুরুপাদাশ্রয়ে মধ্যে includ. গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত অন্যান্য ভক্ত্যংগ 'শ্রম-এব-হি কেবলম্' শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করে অন্যান্য ভক্ত্যংগ যাজন করলে ফল ফলবেই। শ্রীগুরুচরণাশ্রয় পূর্বক গুর্ব্বানুগত্যে গুরুসেবা ও হরিসেবা যেখানে নেই, সেখানে মংগলের কোন রাস্তা নেই। কারণ উদ্ধারের মালিক শ্রীগুরুদেব ব্যতীত আর কেউ নেই। সবাই এই দেবীধামের অন্তর্ভুক্ত। বিরজা পার হবার ক্ষমতা তার নেই, সদ্গুরু ব্রহ্মাণ্ডের অতীত বস্তু। যি নি গোলোক থেকে আসেন তিনি সেখানে নিয়ে যেতে সমর্থ। জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলেন - আমরা জীবাত্মা ভগবৎ সেবক কিন্তু শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সেবক ভগবান্ আমরা বশ্যতত্ত্ব কিন্তু শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর হয়েও আমাদেরকে ভগবৎ সেবা শিক্ষা দেন। শ্রীগুরুদেব মর্ত্যবাসী জীব নয়, তিনি অমর বস্তু, নিত্য বস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য, তাহার সেবক নিত্য, তাঁর সেবাও নিত্য। সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের মরণ বলে কোন জিনিষ

নেই। এই সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণ করলে আমরা নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সুখী হতে পারবো। আমরা যদি নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্বাদ প্রার্থী হই তা'হলে করুণাময় শ্রীগুরুদেব আমাদেরকে কৃপাকরে সর্ববিধ মংগল অবশ্যই প্রদান করবেন। শিষ্য মাত্রেই শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলে জানা কর্তব্য। নতুবা ভগবৎ প্রাপ্তির আশা নেই। শ্রীগুরুদেবে ভগবৎবুদ্ধি ও প্রেষ্ঠবুদ্ধিই সমস্ত মংগলের মূল। যিনি গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলে জেনে কায়-মনো-বাক্যে প্রীতির সঙ্গে তাঁর সেবা করেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেছেন– "শ্রীমদ্‌গুরু-পদাম্ভোজ কৃপা মাত্রৈকসাহস" শ্রীগুরুপাদপদ্মই জীবের একমাত্র সাহস ও ভরসা। শ্রীগুরুদেবই জীবের একমাত্র রক্ষক। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত ব্যক্তিই সাহসী, বলবান্, নির্ভীক, নিশ্চিন্ত সুখী ও শান্ত এবং তাঁর সকল মঙ্গল বিরাজিত। 'ভগবৎ কৃপা প্রাপ্তিস্তুভগবৎপ্রিয়জনানাং প্রসাদাদেব ভবতি'- ভগবৎ প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই ভগবৎ কৃপা লাভ হয়ে থাকে। অন্য কোন উপায়ে লাভ হয় না। বরং মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই হয়। কারণ যারা ভগবৎ প্রেষ্ঠ পারমার্থিক গুরুদেবকে আশ্রয় না করে নিজ চেষ্টায় ও ভরসায় উত্তীর্ণ হতে চায়, তারা কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হতে চায়। শাস্ত্র বলেন- 'সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত সেবিনাম্। নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্ত পরিচর্য্যারতাত্মনাম্।।'

যারা ভক্তরাজ শ্রীগুরুদেবের সেবায় উদাসীন হয়ে স্বতন্ত্র ভাবে ভগবানের সেবা করার চেষ্টা করেন, তাঁদের সিদ্ধি হয় না। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে যাঁরা ভগবৎ সেবা করেন তাঁদের সিদ্ধি অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত ও অনিবার্য্য। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীগৌরসুন্দর বলেছেন–

"মোর ভক্ত প্রতি প্রেমভক্তি করে যেই।
নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সেই।।
মোর ভক্ত না পূজে আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক-নহে মোর প্রসাদের পাত্র।।"
(চৈঃ ভাঃ)

আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন--
"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।।"

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,- 'হে অর্জুন যারা ভক্তরাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা বাদ দিয়ে আমার সেবা করতে চায় তাঁরা আমার প্রকৃত ভক্ত নয়। আর যাঁরা আমার ভক্তের ভক্ত অর্থাৎ গুরুভক্ত তারাই প্রকৃত ভক্ত।' এ ছাড়া শ্রীমদ্‌ভাগবতে-
"নাহমিজ্যা প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা।।"

আমি গুরুসেবা দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হয়ে থাকি;গৃহস্থ ধর্ম, সন্ন্যাস ধর্ম বা অন্য কোন কিছুর দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না। অর্থাৎ 'ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।' তিনি অন্য কোথাও থাকেন না। তিনি ভক্ত বশ। ভক্ত তাঁকে যখন যেখানে যেভাবে রাখেন ভগবান্ সেই ভাবে থাকেন। ভক্ত ছাড়া তিনি অন্য কিছু জানেন না, তিনি কাউকে চিনেন না। সেই ভক্তের পিছনে পিছনে অনুগমন অর্থাৎ ভক্তকে সন্তোষ করলে ভগবান্ এমনিতে বশীভূত হয়ে যান। ভগবানকে বাঁধার অন্য কোন পন্থা নেই। যে দাম্ভিক ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে ভক্ত সেবা ত্যাগ করে বা বাদ দিয়ে নিজেই ভগবানের সেবা করতে যায় সেই ব্যক্তি বিফল হয় অর্থাৎ কোটি কল্পকালে অনুসন্ধান করেও ভগবানের পদনখ সৌন্দর্যের হদিস পায় না। তাই শাস্ত্র ও মহাজনগণ গুরুসেবার উপর এত জোর দিয়েছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল জীব

গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলেছেন–

"ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্‌বরিষ্ঠা গুরৌ যদি।
মমাস্তি তেন সত্যেন সন্দর্শয়তু মে হরিঃ।।"

" তস্মাদন্যদ্ ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে "- শ্রীহরি প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি বর্তমান সেরূপ শ্রীগুরুর প্রতিও যদি উত্তম ভক্তি বর্তমান থাকে তবে শ্রীহরি আমাকে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করান। সুতরাং গুরুসেবা ব্যতীত অন্য ভগবৎ ভজনেরও অপেক্ষা থাকে না। তাই গুরুসেবার দ্বারা সর্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ অচিরেই ভগবৎ পাদপদ্ম প্রাপ্তি হয়। যে পাদপদ্ম দর্শনের জন্য যোগি-ঋষিরা কোটি কোটি যুগ তপস্যা, ধ্যান করেও যাঁর একটা কৃপা কণাও লাভ করতে পারে না সেই মহাসুদুর্লভ পাদপদ্ম একমাত্র গুরুসেবা দ্বারাই অনায়াসে লাভ করা যায়। সাধকজীবনে যে সমস্ত অনর্থ এসে ভজনে বাধা সৃষ্টি করে এবং সাধক নিজে বহু চেষ্টা করেও সেই অনর্থ থেকে মুক্ত হতে পারে না, সেই সমস্ত অনর্থ রাশি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাতেই সাধক অত্যল্প কালের মধ্যে জয় করতে পারে। গুরুসেবার এতই অসমোর্দ্ধ মহিমা। ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে নারদবাক্যম্ -

"অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ।।
আন্বিক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া।।
কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া।।
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন, সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ।।"

অসঙ্কল্পদ্বারা কাম জয় করবে, এইরূপ কাম পরিত্যাগ দ্বারা ক্রোধ, অর্থানর্থবিচার দ্বারা লোভ, তত্ত্ববিচার দ্বারা ভয়,

আত্মানাত্মবিবেক জ্ঞান দ্বারা শোক মোহ, মহাপুরুষের সেবা দ্বারা দম্ভ, মৌন দ্বারা যোগের অন্তরায় সমূহ, কামাদি চেষ্টারাহিত্য দ্বারা হিংসা, কৃপা দ্বারা ভূতজন্য দুঃখ, সমাধি দ্বারা দৈবদুঃখ, যোগবলদ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ, সত্ত্বগুণের সেবা দ্বারা নিদ্রা, সত্ত্বগুণ দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ এবং উপশম দ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। এত সব গুণ সাধক একমাত্র গুরুসেবাতে অনায়াসে জয় করিতে পারে। কারণ ভগবানের সর্বশক্তি ও সর্বগুণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিরাজিত। সেজন্য অনর্থ যুক্ত সাধক কায়মনোবাক্যের দ্বারা শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট ও প্রীতিপূর্ণ সেবায় অত্যল্পকালের মধ্যে অনর্থ মুক্ত হয়ে শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে পৌঁছাতে পারে। সাধকজীব একাকী ভগবানের পাদপদ্মে যেতে পারে না। শ্রীগুর্ব্বানুগত্যই সংসিদ্ধি। শ্রীগুর্ব্বানুগত্যের দ্বারা একমাত্র হরিতোষণ হয়। সেইজন্য শাস্ত্র বলেন, তোমার পূজা ভগবান্ গ্রহণ করতে পারে, নাও পারে তাতে সংশয় আছে কিন্তু যিনি সর্বতোভাবে সর্বক্ষণ সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন করছেন তাঁর সেবা-পূজা করলে অবশ্যই সাধক সিদ্ধি লাভ করবে এতে কোন সংশয় নেই। ভক্তের সেবায় ভগবান্ প্রীত হন। শ্রীগুরুদেব প্রীত হলে ভগবান্ প্রীত হন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ অন্য কোথাও নেই। ভক্তের হৃদয় মন্দিরে নিয়ত বিরাজমান। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা পথে বাধা প্রদানকারী কারও কথা শুনতে হবে না । শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম করুণার মূর্তি ধারণ করে এজগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি ভগবৎ দ্রষ্টা ঋষি। তাঁর দিব্য অপ্রাকৃত চেতনবাণী শ্রবণ করলে মরা মানুষও জেগে উঠবে। তাঁর প্রত্যেকটি দিব্য চেতনময়ী বাণী প্রত্যেক ঘুমন্ত জীবকে কৃষ্ণ উন্মুখ করে তোলে । সুপ্ত আত্মাকে কৃষ্ণ অভিসারে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি গুরুমুখে ভগবানের পবিত্র লীলাকথা শ্রবণ করে কীর্তন করেন ভক্তবৎসল শ্রীহরি অচিরকালের মধ্যে স্বয়ং তার হৃদয়ে প্রবেশ করেন।

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতং।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ।।"

শ্রীগুরুদেব সন্তুষ্ট হলে ভগবান সন্তুষ্ট হন। যদি কখন শ্রীভগবান রুষ্ট হন তথাপি শ্রীগুরুদেব রক্ষা করেন অর্থাৎ শিষ্যের হয়ে ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ভক্তের কথা ভগবান ফেলতে পারেন না।

"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতি কুতোঽপি ।

*   *   *

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন্।
তস্মাৎ সর্ব প্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ।।

*   *   *

হরি স্থানে অপরাধে তারে হরিনাম
তোমা স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ।।

শিষ্যের প্রাণ বা জীবনীশক্তি শ্রীল গুরুদেব। করুণাবরুণালয় শ্রীলগুরুপাদপদ্ম কোন কারণে যদি শিষ্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হন তবে শিষ্যের মংগলের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয় যায়। অসাবধানতাবশতঃ বা অজ্ঞাতে যদি গুরুদেব অসন্তুষ্ট হন তবে শিষ্য কায়- মন-বাক্যে নিষ্কপটে প্রণিপাত, দৈন্য এবং নিজের অযোগ্যতাবশতঃ শত শত অপরাধ ও দোষ দেখিয়ে গুরুদেবের সন্তোষ করতে হবে। অক্সিজেন বিনা যেমন আলো জ্বলতে পারেনা তেমনি গুরুদেবের প্রসন্নতা ছাড়া শিষ্যের জীবন প্রেমভক্তির দিকে যেতে পারে না। সাধক জীব শ্রীগুরু- পাদপদ্মের সুখ চিন্তায় তন্ময় থাকে। কি ভজনে, কি ভোজনে, কি শয়নে, কি জাগরণে, সর্বকালে অর্থাৎ জীবনে- মরণে, সম্পদে- বিপদে, দূরে-নিকটে, দিনে- রাত্রে, প্রভাতে, সন্ধ্যায়, সংকীর্তনে মহাপ্রসাদ সেবনে, বিশ্রামাদি সর্বাবস্থায় গুর্ব্বানুগত্য ও গুরুসেবা

করবে। যেখানে গুর্ব্বানুগত্য ও গুরুর প্রতি আপনজ্ঞান ও প্রবল আদর নেই, যেখানে হরিনাম সংকীর্তন মন্ত্রজপ, শাস্ত্রপাঠ, ঠাকুর সেবা প্রভৃতি দ্বারা কৃষ্ণ প্রসন্ন হয় না বলে কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি কিছুই হয় না।

"বলবান্ আদরো যস্য ন স্যাদ্ গুরুপদাম্বুজে।
শ্রুতৈরপ্যস্য সচ্ছাস্ত্রৈ কৃষ্ণে ভক্তির্ন জায়তে।।"

সমস্ত জীবনীশক্তি দ্বারা সর্বস্ব সমর্পণ করে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আশ্রয় করতে হবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞানে সেবা করলে অচিরেই সাধক অন্যাভিলাষশূন্য ও সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত হয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভ সেবক হয়ে যায়।

শাস্ত্র বলেন,- 'কাম ক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্। শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমো গুরুঃ।।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ) কামে আসক্তি, ক্রোধে উন্মত্ত, অত্যন্ত কৃপণ এবং বিষাদগ্রস্থ অর্থাৎ ভয়-মোহ দ্বারা শোকগ্রস্থ ও বিহ্বল এরূপ চঞ্চলযুক্ত অস্থির ব্যক্তিও যার উপদেশ শ্রবণে চিত্ত উৎফুল্ল হয়, সেই বক্তাই পরমগুরু। তাঁকে গুরুত্বে বরণ করতে হবে। তাঁরই চরণাশ্রয় করে তার আদেশ-নির্দ্দেশে ভজন জীবন গঠন করতে হবে। এখানে একটা কথা আছে যে, ভাগ্যানুসারে গুরু মিলে। জীবের পুঞ্জীভূত বাসনা ও সুকৃতি অনুসারে গুরু মিলে। কারণ জীব হৃদয়ে যে চৈত্ত্যগুরু আছেন তিনি জীবের প্রত্যক্ষ কর্মফলদাতা। তিনি জীবের বাসনানুযায়ী সেই রকম গুরু মিলিয়ে দেন। ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়–

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভি সুকৃতি পূর্বসঞ্চিতৈ।।"

'সুকৃতৈ পূর্বসঞ্চিতৈ' বাক্যানুসারে পূর্ব পূর্ব জন্মের কিছু ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি জমা হয়ে থাকে এবং চিত্তে সদ্ভক্তিবাসনা জাত হয় তবে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী স্বৈরিণী

কৃপায় রূপানুগাচার্যের পাদপদ্ম দর্শন ও আশ্রয় করার সৌভাগ্য পায়। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈবভজাম্যহম্' অনুসারে যে আমার কাছে ধন-জন, প্রতিষ্ঠা, কনক -কামিনী চায় সে সেরূপ গুরুর সন্ধান পায়। অর্থাৎ তাকে আমি সেইরূপ গুরুকে দিয়ে বঞ্চনা করি। আর প্রকৃত মংগললাভেচ্ছু, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবালাভেচ্ছু সৎসাধকগণকে আমি রূপানুগজনের চরণাশ্রয় করিয়ে দিই। সর্ব অন্তর্যামী ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন জীবের কামনানুযায়ী গুরু প্রেরণ করেন। যাঁরা কপট কামী, লোলুপ তাদের কাছে এরকম গুরু পাঠান, আর যারা তাঁর চরণকমলের সেবা ছাড়া অন্য কিছু চায় না তাঁদের কাছে ভগবান গুরুরূপ ধারণ করে সদ্গুরু নামে ভূতলে অবতরণ করেন।

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।।"

এছাড়াও শ্রীগৌরসুন্দর শ্রদ্ধালু 'সত্যানুসন্ধিৎসু' জীবকে জগদ্গুরুর সন্ধান জানিয়ে দেন বা দেখিয়ে দেন। আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় দেখতে পাই যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে তাঁর ঈশিতা প্রকাশ করলেন তখন নিতাই ঠাকুর তীর্থভ্রমণ ছেড়ে নদীয়ায়এসে শ্রীনন্দনাচার্যের গৃহে লুকিয়ে রইলেন। এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীবাস ঠাকুরকে পাঠালেন অবধূত ঠাকুরকে খুঁজে আনার জন্য কিন্তু তাঁরা সারাদিন পরিশ্রম করে কোথাও নিতাই ঠাকুরের সন্ধান পেলেন না। অবশেষে শ্রীগৌরসুন্দর একটু হাসলেন এবং নিজে গিয়ে নন্দনাচার্যের গৃহে উঠলেন এবং নিত্যানন্দ মহিমা জগতে প্রকাশ করলেন। নিত্যানন্দ তত্ত্ব অত্যন্ত নিগূঢ়। আমি যদি না জানাই তবে কারুর সাধ্য নাই নিতাই ঠাকুরকে পায়। সেজন্য সৎসাধক সদ্গুরুপাদাশ্রয় লাভের জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের কাছে সকরুণ আবেদন জানাবে। তখন শ্রীগৌরসুন্দরই তার কাছে সদ্গুরুকে প্রেরণ করবেন। নচেৎ নিজের

বিচার-বুদ্ধি অক্ষজ জ্ঞান দ্বারা গুরু আশ্রয় করতে গেলে ঠকতে হবে। অবশেষে গুরুব্রুবের হাতে পতিত হয়ে অনন্তকালের জন্য নরকে গমন করতে হয়। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যদি কারুর ভাগ্যে সদ্‌গুরুর দর্শন পাওয়ার আগে লৌকিক - কৌলিক গুরুকরণ হয়ে থাকে তবে তাকে সর্বপ্রথমে ওই গুরু ত্যাগ করে উল্কার মতো বিশ্ব তোলপাড় করে সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করতে হবে।

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্‌বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ।।"
(নারদ পঞ্চরাত্র)

স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রলাভ করলে নরক গমন হয়। অতএব যথা শাস্ত্রমত পুনরায় বৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করবে। সেইজন্য সাধক যখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করবে তখন তাকে সতর্ক হয়ে গুরুকরণ করতে হবে। কারণ জগতে কর্মীগুরু, জ্ঞানীগুরু, যোগীগুরু, নির্বিশেষবাদী গুরুর অভাব নেই। তাদের কবলে পড়লে মায়ার ব্রহ্মাণ্ড থেকে উদ্ধারের কোন পথ নেই। আবার অনেককে দেখা যায় ভগবানের কথা দিবারাত্র কীর্ত্তন করছেন কিন্তু ভগবৎ কথা কীর্ত্তন করে পয়সা নিচ্ছে। তারা ভগবানকে তথা ভগবানের কথাকে বিক্রয় করছে। তাদের কাছে ভগবদ্ কথা শুনতে হবে না। এক কৃষ্ণনাম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি রত্নরাজির চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশী। কারণ ধনরত্ন ত' এজগতের বস্তু। আর অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম অপ্রাকৃত জগতের অপ্রাকৃত বস্তু। তাঁকে কোন জাগতিক বা প্রাকৃতিক মূল্য দ্বারা পাওয়া যায় না। যে এক কৃষ্ণনামের ফলে,-- "এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।।
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার।।

অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এতধন।।"
(শ্রীচৈ:চ:আ:--৮/২৬-২৮)

এক কৃষ্ণ নামের ফলে এতসব বস্তু পাওয়া যায়। যে নাম গ্রহণ করলে কৃষ্ণ সেবাপ্রাপ্তি, গোলোকে গমন, দিব্যদেহ লাভ হয়, আর সেই নাম করে তার বিনিময়ে আমরা পয়সা নিচ্ছি। এ যে কি জঘন্যতম অপরাধ তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই সব অবৈষ্ণবের মুখে কখনও ভাগবত শুনতে নেই। আর সেইরূপ গুরুর কাছে আশ্রয়ও নিতে নেই। কারণ এরা ভাগবতকে পণ্যদ্রব্য করে ফেলছে। যে কথা নিয়ে গোপীগণ কত বছর মাথুর বিরহে কাটালো, সে কথারস নিয়ে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু গম্ভীরায় স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দ সঙ্গে রসাস্বাদন করলেন, আর সেই কথা নিয়ে এরা নিজের জীবিকা অর্জন করছে। এদের মুখে কখনো ভাগবত কথা উচ্চারণ হয় না। এ সমস্ত ভাগবত ব্যবসায়ী গুরুর কথা বলা হচ্ছে না। বক্তা দু প্রকার, --

"বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃৎ ন সংস্পৃশেৎ।।
উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্‌ভবেৎ।।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

সরাগবক্তা লোলুপ, কামী তার উক্তি শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করে না । তিনি কেবল উপদেশই প্রদান করেন কিন্তু নিজের জীবনে কখনো উপদিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা করেন না। পরন্তু পরীক্ষা না করে উপদেশ প্রদান করলে তা লোকনাশার্থই হয়ে থাকে। তা কেবল ভাষা ও পরোপদেশে পাণ্ডিত্যই সার হয়। নিজের জীবনে এক অক্ষরও আচরণের লেশমাত্রও নেই । এ প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, --

াদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকৃত প্রস্তাবে চিন্ময় অনুভববিশিষ্ট শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ নয় অথচ যারা কল্পনা বা আরোপের দ্বারা াম-ক্রোধাদি রিপুর দাস বদ্ধজীবকে বা সাধকজীবকে 'গুরু' মনে রে তাকে নিত্যানন্দের আসনে বসাবার অমার্জনীয় অপরাধ করে সেই সকল মনোধর্ম্মী অতিবাড়ী ও ব্যভিচারী ব্যক্তিগণের যে চেষ্টা, া অমার্জনীয় অপরাধ দুষ্ট ও পাপদুষ্ট ব্যবহার। কিন্তু যিনি প্রকৃতই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম অর্থাৎ যাঁর প্রত্যেকটি কার্য্য শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের সুখানুসন্ধানময়, তাঁর সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতায় যে ব্যক্তি বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস ও সন্দেহ করে, সেই ব্যক্তির গুরুকরণত' হয় নি, পরন্তু সেই ব্যক্তি নারকী ও অপরাধী। কারণ দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে প্রথম নামাপরাধ তার কাটে নি। প্রকৃত সাধুকে অসাধু জ্ঞান, আবার অসাধুকে প্রকৃত সাধু জ্ঞান, এটাই গুর্ব্ববজ্ঞা। বদ্ধজীবের সম্বলমাত্র নিজের অক্ষজ জ্ঞান দ্বারা বিচার। এই অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা সাধু অন্বেষণ করতে গেলে প্রকৃত সাধুর দর্শনত' হয় না। পরন্তু গুরুব্রুবর হাতে পতিত হয়ে চির মঙ্গলের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আধ্যক্ষিকের পতন অবশ্যম্ভাবী। আর নীরাগ বক্তা জড়ে এমনকি ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুতে তাঁর আসক্তি নেই। পরন্তু ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পর্য্যন্ত সে কিছুই চায় না। কৃষ্ণেতর বস্তুর সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই। কেবল কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুতে তাঁর আদর। কোন যোগ-বিভূতি তাঁকে টলাতে পারে না। ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য এলে নীরাগ বক্তা ফিরেও তাকায় না।

"ত্রিভুবনবিভবহেতবেহপ্যকুণ্ঠ,
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা,-
ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ।।"

(শ্রীভা: -- ১১/২/৫৩)

এছাড়াও নিজের কোন প্রকার আত্মসুখ বাঞ্ছার লেশমাত্রও থাকবে না। ভগবানের চিল্লীলা মিথুনের সেবা চিন্তায় সতত বিভোর ও তন্ময়। অন্যদিকে মন যাওয়ার অবসর নেই। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম মধুপানে তাঁর মন সতত বিভোর। তিনি ভগবানের চিন্ময় লীলার অনুভব বিশিষ্ট। এই নীরাগ বক্তার হৃদয়োত্থিত বেদবাণী শ্রবণ করলে জীবের সুপ্ত আত্মা জেগে উঠে এবং কৃষ্ণ অভিসারে ছুটে চলে। নীরাগ বক্তা তাঁর হৃদয় মন্দিরে নিজ প্রাণনাথকে বসিয়ে তাঁর কথা বলছেন। নীরাগ বক্তা আচরণশীল। তাই তাঁর কথায় মরা মানুষ জেগে উঠে। এই নীরাগ বক্তাই জগদ্‌গুরু হয়ে এসে জগতের বহুবিধ মঙ্গলবিধান করেন।

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।।"

(শ্রীভা: - ১১/২/৩৭)

উপরিউক্ত শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতের কৌস্তুভমণি স্বরূপ। সিদ্ধান্তাচার্য শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ স্বরচিত 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে'র প্রথমেই এই শ্লোকের অবতারণা করেছেন এবং অনন্য ভক্তি সাধকের পক্ষে, কেবলা ভক্তি সাধকের পক্ষে এই শ্লোকটি প্রাণ-জীবন- রত্ন-মণি সদৃশ। এই শ্লোকের মধ্যে কেবল অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা উল্লেখ আছে। সাধক শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিভৃত প্রকোষ্ঠে চরম ও পরম সেবা লাভের যোগ্যতা লাভ করতে পারে যদি সে রাধাজনত্বের পরিপূর্ণ আনুগত্য করে অর্থাৎ শ্রীরাধাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম রূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবা শিক্ষা দিচ্ছেন, এটা সম্যকরূপে উপলব্ধি করে হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে বরণ করে তাঁকে কোটি প্রাণাভীষ্টবোধে, কোটিকোটি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তা বোধে এবং

সেইরূপ প্রীতির সঙ্গে আনুগত্যের ফলে জীব ভববন্ধন থেকে চিরমুক্তি লাভ করে চির প্রেমের সাগরে ডুবে যায়। এটা কেবলমাত্র গুরুদেবতাত্মার দ্বারা সাধক জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মকে হৃদয় মন্দিরে বসিয়ে তাঁর মনোঽভীষ্ট সেবায় সাহায্য করাই জীবনের সার্থকতা। শ্রীমদ্ভাগবতে ও মহাজনের বাণীতে জানা যায় শ্রীগুরুদেবের সেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য, একমাত্র ধর্ম্ম, একমাত্র আশা ও আকাঙ্ক্ষা। সেই পরম করুণাময় গুরুদেবের সেবা প্রতি বর্ষ প্রারম্ভে, প্রতিমাস প্রারম্ভে, প্রতিদিন প্রারম্ভে, প্রতিক্ষণ করাই আমাদের জীবনের একমাত্র মূল উদ্দেশ্য। শ্রীগুরুদেবকে আমাদের ভজন জীবনের মূলকেন্দ্রে বসাতে হবে। তাহলেই স্বাভাবিকভাবে শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীরাধা-গোবিন্দ আমাদের হৃদয়ে বসে যাবেন। এটাই এই শ্লোকের নিগূঢ় অভিপ্রায় ও নিগূঢ় সিদ্ধান্ত।

এখন প্রশ্ন হতে পারে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা করব তারজন্য গুরুদেবতাত্মা হতে হবে কেন? এর একমাত্র কারণ হলো, -- শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিজজন ছাড়া অন্য কেউ শ্রীরাধা-গোবিন্দের দর্শন বা সেবা লাভ করাতে পারবে না। যেমন প্রধান মন্ত্রীর কাছে সাক্ষাৎ করতে হলে তার দ্বাররক্ষীর অনুমতি দরকার, এবং সেই gate keeper -ই বলে দিবেন তিনি কখন থাকেন এবং কিভাবে তাকে পাওয়া যাবে। তদ্রূপ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবারাজ্যের একছত্র মালিক হলেন শ্রীগুরুদেব। তাঁর আদেশ, অনুমতি বিনা সেখানে প্রবেশ লাভ অসম্ভব। সর্বোপরি তাঁর আনুগত্যে, তাঁর পরামর্শে কেবলমাত্র সেই নিগূঢ় পরম রমণীয়, পরম গোপনীয় সেবারাজ্যে প্রবেশ লাভ হতে পারে। সেইজন্য শ্রীরাধাজনত্বের এত প্রয়োজনীয়তা। শ্রীরাধাজন ছাড়া শ্রীমতীর সেবা অন্য কেউ দিতে পারে না। যিনি শ্রীমতি রাধাঠাকুরাণীর নিত্যসেবা করেন একমাত্র তিনিই শ্রীরাধার সেবা দিতে পারেন।একমাত্র তিনিই সেবা বিতরণের

মালিক। অন্য কেউ এর মালিক নয়। এজগতেও দেখা যায় একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী একটি লোককে তার কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ করার ক্ষমতা আছে। সেইরূপ শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের অন্তরঙ্গ সেবা যজ্ঞের ভাণ্ডারী। তিনি যদি কাউকে সেবা যজ্ঞে প্রবেশ করার কৌশল বা মন্ত্র শিখিয়ে দেন অথবা অহৈতুকী কৃপা করেন, তবে সেই ব্যক্তিই একমাত্র প্রবেশ করতে পারে। এইখানেই তাঁর অসমোর্দ্ধ শ্রীরাধাজনত্বের বৈশিষ্ট্য। শাস্ত্রে মহাজনগণ এইজন্য শ্রীগুরুদেবতাত্মা হওয়ার কথা কীর্ত্তন করেছেন। শাস্ত্রে ভগবানকে পাওয়ার বহু পথ বললেও এখন কলিযুগে সেই সব দান, ধ্যান, ব্রত, তপস্যা, স্বাধ্যায়, যম-নিয়মাদির দ্বারা ভগবানকে পাওয়া কলিহত জীবের পক্ষে সুদুষ্কর। শ্রীভগবদ্ প্রেরিত মহাজনের শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী আত্মসমর্পণ ও শ্রীগুরুদেবকে নিষ্কপট ভালবাসা, তাঁর আদেশ নির্দ্দেশ পালনই সেই রাজ্যে প্রবেশের একমাত্র সহজতম উপায় বলে শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করেছেন। অন্য কোনও উপায়ে সেইরাজ্যে প্রবেশ করা যাবে না। কত উচ্চে শ্রীগোলোক বৃন্দাবন! আর কত নিম্নে আমরা! কি করে আমরা শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা লাভ করতে পারি? যখন সেই দয়ালু শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজেই গুরুরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসেন তখন আমাদের সৌভাগ্যের সূচনা হয়। এই সুযোগে ভাগ্যবান্ জীবগণ শ্রীগুরুঃপাদপদ্মে আত্মনিবেদন, আত্মসমর্পণ, শরণাগতির দ্বারা সেইরাজ্যে প্রবেশ লাভ করে। অতএব সেই প্রেমের সর্ব্বোচ্চস্থানে আরোহণ করতে হলে সেখানকার নিত্যসিদ্ধ প্রেমিক শিরোমণি রাগাত্মিক ব্রজজনের আনুগত্যে কায়,মন,বাক্যে অহৈতুকী আত্মসমর্পণ একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীগুরুদেবের সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্রতায় যার বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই শ্রীগুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধিকারী, অসূয়াপরায়ণ, মৎসর অতএব অপরাধী। শ্রীগুরুদেবকে যে ব্যক্তি নিজেরই মত

ক্তে মাংসের ধর্ম্মযুক্ত জীব বলে মনে করে অথচ বাইরে অর্চ্চনাদির আড়ম্বর দেখায় সেই দাম্ভিক বা কপটী শ্রীহরিদেবকে পূর্বেই পরিত্যাগ করেছে। তার বাহ্য গুরুপূজার অভিনয় দৌরাত্মময়-আত্মবঞ্চনা চেষ্টার আদর্শ।

পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা জগদ্‌গুরু রূপানুগাচার্য্য নির্ণয় করা অসম্ভব। ধর্ম্মগ্রন্থ পড়ে বা তাতে সাধু বা গুরুর লক্ষণ এবং আচার ও প্রচারের কথা শুনে যদি কোনও ব্যক্তি গুরুকে মাপতে চায় তবে তার কোনও দিন গুরু দশর্ন হবে না। শ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রমাণচক্রবর্ত্তীচূড়ামণি গ্রন্থ হতে শ্রীগুরুদেবের লক্ষণ, মহতের লক্ষণ ও আচরণাদি, এমনকি পূর্ব মহাজনগণের আচারাদি কথা অবগত হয়ে বা স্বচক্ষে দর্শন করার অভিমান করেও আধ্যক্ষিক জ্ঞান প্রতারিত বদ্ধজীব অর্থাৎ লঘু ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পায় না। ঐ সকল লক্ষণ ও আচার প্রচারের সঙ্গে মিলিয়ে বদ্ধজীব মহৎ বা শ্রীগুরুদেবকে চিনতে পারে না। চিনতে পারা ত' দূরের কথা চিনবার দুষ্প্রবৃত্তি হলেও তার সর্বনাশ হয় অর্থাৎ সে অপরাধ পঙ্কে চির নিমজ্জিত হয়।

"নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম অধিকারী।
অল্পভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি।।
তাহার আচার বিধি নিষেধের পার।
তাহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার।
না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ।।"
(শ্রীচৈ: ভা:অ: -- ৬/১১৫-১১৯)

নিজের অক্ষজ জ্ঞানকে সম্বল করে সাধুকে মাপতে গেলে কিরূপ বিষময় ফল ফলে তার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, — প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে কোন এক বিশেষ পণ্ডিত ও ত্যাগীব্যক্তি

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আচরণের কথা পাঠ করে সেরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট গুরুর অনুসন্ধানে বহির্গত হন। সে ব্যক্তি কোন মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ জগদ্‌গুরুর দর্শনার্থ গমন করে যখন দেখতে পেলেন যে, সেই মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ তার ধারণানুযায়ী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর ন্যায় তক্রমাত্র ভোজী নয় বা কৌপীন মাত্র ধৃক্ নয় পরন্তু তিনি আচার্য্যোচিত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অবস্থান করেন, তখন উক্ত ব্যক্তির সিদ্ধান্ত হল যে, পৃথিবীতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ন্যায় নিষ্কিঞ্চন কোন গুরু নেই। ঐ ব্যক্তি তার পঠিত ও কল্পিত ধারণার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের সন্ধান করতে গিয়ে এরূপ অপরাধে নিমজ্জিত হল যে, আর কোনদিন তার সদ্‌গুরুপাদপদ্মের সন্ধান লাভ হল না বা সন্ধান লাভের সম্ভাবনা রইল না। এছাড়া আরও কয়েকটি ব্যক্তির বিষয়ে জানা যায় যে, তারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীশ্রীগৌরনারায়ণের আচার ও উপদেশ নিজে নিজে পাঠ করে বহু বৎসর পূর্বে কোন নিষ্কিঞ্চন জগদ্‌গুরুর দর্শনে এসেছিল। যখন তারা দেখল এবং জানতে পারল যে, সেই ভাগবত-পরমহংসপ্রবর বেষ গ্রহণের লীলা প্রকট করার পরও গোলোকানুভূতিতে পূর্বাশ্রমে অবস্থান করছেন, তখন সেই সকল ব্যক্তি মহাভাগবত পরমহংসের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়াত' দূরে থাকুক, পরন্তু সেই মহাভাগবতের নিন্দুক হয়ে অনন্ত নিরয়গামী হয়ে গেল। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মাপতে গিয়ে শক্তিশালী পুরুষগণেরও যে কি অবস্থা হয় তা প্রদর্শন করার জন্য শ্রীদামোদর পণ্ডিত, শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র, শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতির ন্যায় শ্রীগৌরপার্ষদগণ কৃপা পূর্বক যে সকল লীলা অভিনয় করেছিলেন তাই সুবুদ্ধি সাধকগণের সম্মুখে অনাদিকাল সতর্কতার পতাকারূপে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকবে।

শ্রীদামোদর পণ্ডিত 'নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য' শ্লোকের বক্তা শ্রীগৌরসুন্দরকে রাণ্ডী ব্রাহ্মণের বালকে প্রীতি কেনে কর?'

অথবা শ্রী প্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীরায় রামানন্দের দেবদাসী সেবার মর্ম্ম বুঝতে না পেরে জগদ্‌গুরু শ্রীরায় রামানন্দের প্রতি যেরূপ বিচার করার অভিনয় করেছিলেন অথবা শ্রীল গদাধর পণ্ডিত শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর প্রতি লোক শিক্ষার্থ যেরূপ ধারণা করার অভিনয় করেছিলেন অথবা শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু কোন লৌকিক গোস্বামীকে বঞ্চনা করার জন্য অপ্রাকৃত শ্রীগৌরজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে 'কলির ব্রহ্মাণ্ড' হতে মাথায় করে শ্রীধামে আনার যে আদেশ প্রদান প্রতীম লীলা করেছিলেন, সেই সকলের মর্ম্ম কেউ পুঁথি পত্র পড়ে বা বিচার বুদ্ধি মনীষার দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে না অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বিচারের আধারে মাপতে পারে না। এজন্যই শ্রীশ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে একাধিকবার উচ্চকণ্ঠে গেয়েছেন, --

"ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ।।"
"ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে হইবে সর্বনাশ।।"
"ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধিনাশ।
নিন্দে অবধূত চাঁদে জগৎনিবাস।।"

সমগ্র শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দ ভৃত্য শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মেপে নেবার দুর্বুদ্ধিকারী ব্যক্তিগণের প্রতি সুতীব্র কশাঘাত করেছেন। এমন কি ,তাদের মস্তকে পদাঘাত পর্যন্ত করে অমায়ায় কৃপা করার অভূতপূর্ব মহাবদান্যতা প্রদর্শন করেছেন। সমগ্র শ্রীচৈতন্যভাগবতের সার উপদেশ যে, শ্রীভাগবতরূপী শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বিমল বৈষ্ণবপাদপদ্মকে মাপতে যেও না। তাতে তোমার সর্বনাশ হবে। তুমি পুড়ে মরবে! তোমার ক্ষুদ্র মস্তিকের আয়তন কতটুকু যে, ব্রহ্মজ্ঞানকে যিনি অতিক্রম

করেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণজনকে তোমার ক্ষুদ্র মস্তিকের দ্বারা মেপে নিতে পারবে। সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে যে, শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। তিনি যাই করেন তাই বিধি ও শাস্ত্র । তিনি জীবের ধারণা বা পুঁথিপত্র হতে লব্ধ বিচারের কিঙ্কর নন। এ কথা স্মৃতি শাস্ত্র বলেন, -- " সময়শ্চাপি সাধূণাং প্রমাণং বেদবদ্‌ভবেৎ ।" বেদের প্রমাণ যেরূপ স্বতন্ত্র, সাধুগণের আচারও সেরূপ স্বতন্ত্র প্রমাণ। ঐকান্তিক মহদ্‌গণ যা করেন তাই শাস্ত্র, তাই বেদ। কারণ তাতে পরতত্ত্বের পরম সুখ হয়। পরতত্ত্বের পরম সুখানুসন্ধান ব্যতীত ঐকান্তিক মহতের কোনই কৃত্য নেই। মায়ার কিংকর বদ্ধজীবের ক্ষুদ্র মাথায় সদসদ্‌ বিচারের ছাঁচে সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঐকান্তিক মহতের আচরণকে ঢালা যায় না। প্রত্যেক আচার্য্যের আচরণ পরস্পর স্বতন্ত্র এবং কৃষ্ণের পরম সুখদ । শ্রীগুরুদেবে যে সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আচরণ প্রকট করেন তা তাদের একচেটিয়া সম্পত্তি। কারণ তিনি ঈশ্বর তত্ত্ব। অনীশ্বর বা অনধিকারী সাধকের অনুকরণীয় নয়। অনুকরণ করলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম জীবকোটির অন্তর্ভুক্ত নন, তিনি ঈশ্বর কোটির অন্তর্ভুক্ত। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন , -- 'শ্রীগুরুদেব অভিন্ন নিত্যানন্দ স্বরূপ, আমার গুরুদেব সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ প্রভু, আমার গুরুদেব যাঁহাকে গুরুদেব বলেছেন তিনি আমার গুরুদেবের নিকট নিত্যানন্দ অভিন্ন স্বরূপ। আপনারা বৈষ্ণব সকলেই নিত্যানন্দ প্রভুর বিচিত্র বিলাস । তাই বলিয়া আমার গুরুদেব নিজ মুখে কখনও বলেন নাই যে, আমি নিত্যানন্দ। তিনি সর্বদাই শ্রীগৌরসুন্দরের দাস গৌরচন্দ্রের মনোঽভীষ্টের সেবাকারী বলিয়াই অভিমান করেন। কিন্তু আমি যদি আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনদিন কর্ণে শুনিতে পাই যে আমার গুরুদেব নিত্যানন্দ স্বরূপ নহেন, সেদিন আমি নিশ্চয়ই জানিব যে আমার গুরুদেব আমাকে অত্যন্ত অপরাধী জ্ঞানে

পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে পাষণ্ডী আমার গুরুদেবকে নিত্যানন্দাভিন্ন অন্য কিছু বলে সেই প্রকার পাষণ্ডীর সহিত আমার যেন স্বপ্নেও সাক্ষাৎকার না হয়।" সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ অভিন্ন গুরুদেবকে কখনও মর্ত্ত্যবুদ্ধি করতে নেই। তিনি আমাদের নিত্য বাস্তব মঙ্গলের জন্য অপ্রাকৃত গোলোক বৃন্দাবন হতে ভৌম প্রপঞ্চে আমাদের মত রূপ ধারণ করে অবতরণ করেছেন। তিনি সম্বন্ধজ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদাতা গুরুদেব।

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ।।"

আরও বহু ভক্তি থাকলেও গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি হলে সমস্ত ভক্তিকার্য্য নিষ্ফলই হয়। সাক্ষাদ্ ভগবান্ বলাতে গুরুতে ভগবানের অংশ বুদ্ধিও করতে হবে না। তিনি স্বয়ং ভগবান্ই। "---গুরুষু নরমতিঃ ------যস্য বা নারকী সঃ" অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব সর্বদেবময়, শ্রীগুরুপাদপদ্মে ১০৮টি তীর্থ বর্ত্তমান। এরূপ গুরুকে সাধারণ মানুষের মত দেখলে তার যে কত সৎকর্ম্মের ফল বিনষ্ট হয় তা নয়, পরন্তু নরকও তার জন্য অবশ্য প্রাপ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে।

শ্রীগুরুদেব ঈশাবতার। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'বন্দেগুরূনীশ' শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, -- 'ঈশাবতারকান্ অহং বন্দে' অর্থাৎ 'ঈশাবতারাঃ' ঈশস্য অবতারা অর্থাৎ ঈশাবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি। আবার 'ঈশাবতারাঃ' -- 'ঈশায়াঃ অবতারাঃ' অর্থাৎ ঈশা বার্ষভানবীর অবতার অর্থাৎ কায়ব্যুহগণ শ্রীদামোদর-স্বরূপ-সনাতন-রূপ- রঘুনাথ প্রভৃতি। 'ঈশাবতার' বলিতে ঈশ কৃষ্ণের অবতার, আর ঈশা বার্ষভানবীর অবতারগণকেও জানিতে হইবে। 'বন্দে গুরূনীশভক্তান্' ঈশ ভক্তগণ কৃষ্ণের অবতার এবং 'ঈশাবতারকান্' বার্ষভানবীর অবতারকে জানতে হবে। আম্নায় ধারার আচার্য্যগণ রসের স্তরভেদে

গাঢ়তার তারতম্যানুসারে রসমহিমার আচার্য্যত্ব, রস গরিমার আচার্য্যত্ব ও চরমে রসমধুরিমার আচার্য্যত্ব প্রকাশ করে উত্তরোত্তর রসের গাঢ়তা ও বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। সোম-সোমমৌলি হতে দারুক, উদ্ধব পর্য্যন্ত রসমহিমার আচার্য্যত্ব প্রকটিত। শ্রীশুকদেব, শ্রীসূত গোস্বামী, শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি স্বয়ংরূপের চরিতলেখ ব্যাসগণ রসগরিমার আচার্য্যত্ব প্রকাশ করেছেন। শ্রীস্বরূপ-সনাতন শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব প্রভু ও শ্রীজীবানুগ গৌড়ীয়াচার্য্য গৌরভক্তগণ মধুর রসের সেবকগণ রসমধুরিমার আচার্য্যত্বি প্রকাশ করেছেন, এঁরা কেবলমাত্র কার্ষ্ণ নন, পরন্তু শ্রীগার্ন্ধবিকার সেবা নিরতাগণ। অর্থাৎ ঈশাবতারগণ - শ্রীরূপানুগ আচার্য্যগণ সকলেই রসমধুরিমার আচার্য্য। গৌড়ীয়বর্য্য শ্রীগুরুদেব-তিনি নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক ব্রজবাসী। স্বয়ংরূপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় প্রকাশ ও বিলাস সমূহ অবস্থিত আছেন তদ্রূপ স্বয়ংরূপার মধ্যেও সেইরূপ মহিষীগণ ও লক্ষ্মীগণ অবস্থিত আছেন। আবার মধুর রসের মূল আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্ন স্বরূপা শ্রীরূপমঞ্জরীই শ্রীগুরুদেব, তাঁর মধ্যেও সকল রসের আশ্রয় বা গুরুবর্গ আছেন। বৈধী ভক্তির গুরুবর্গও শ্রীরূপ গোস্বামীর মধ্যে আছেন। গরুড়ত্ব, হনুমত্ব, উদ্ধবত্ব, পাণ্ডবগণ, অম্বরীষ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি আছেন, বিশ্বকসেন, নন্দ, সুনন্দাদি সমস্তই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য তত্ত্বত সেরূপ বৈধভক্তকেও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর অনুগ বলা যাইতে পারে। তবে শ্রীরূপের নিজস্ব সম্পত্তি অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট উন্নতোজ্জ্বল রস, তার সন্ধান তারা পান না।

শ্রীগৌরসুন্দর ও গদাধর ব্যতীত আর সবই নিত্যানন্দ। শ্রীগৌরসুন্দর সম্বিৎ বিগ্রহ এবং শ্রীগদাধর হ্লাদিনী শক্তি, শ্রীনিত্যানন্দ সন্ধিনীশক্তিমদ বিগ্রহ। তাঁর কৃপা হলে সম্বিদ বিগ্রহ কৃষ্ণের ও

তৎপরে হ্লাদিনীর কৃপা লাভ হয়। সন্ধিনী, সম্বিৎ, ও হ্লাদিনী সকলের মধ্যেই আছেন। নিত্যানন্দে সম্বিৎ ও হ্লাদিনী, কৃষ্ণে সন্ধিনী ও হ্লাদিনী বর্ত্তমান, আবার শ্রীরাধারাণীতে সম্বিৎ ও সন্ধিনী আছে। হ্লাদিনী সার সমবেত সম্বিৎ বৃত্তির নামই ভক্তি। সম্বিদ্ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং হ্লাদিনীর মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীরাধা এঁদের শ্রীচরণকমলে শ্রীগুরু, শাস্ত্র, শ্রদ্ধা, রুচি, অনুগতি ও সিদ্ধি নিত্য অবস্থান করেন। সেখান হতে প্রপঞ্চে এই সকল নিত্য বস্তুর অবতরণ হয়।

"গুরুঃ শাস্ত্রং শ্রদ্ধা রুচিরনুগতিঃ সিদ্ধিরিতি মে
যদেতৎ তৎসর্ব্বং চরণকমলং রাজতি যয়োঃ।
কৃপাপূরস্পন্দস্নপিতনয়নাম্ভোজযুগলৌ,
সদা রাধাকৃষ্ণাবশরণগতী তৌ মম গতিঃ।।"

অর্থাৎ যাঁহাদের উভয়ের শ্রীচরণকমল আমার গুরু, শাস্ত্র, শ্রদ্ধা, রুচি, আনুগত্য ও সিদ্ধি এই সর্ববিধরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন এবং যাঁহাদের নয়নকমলযুগল কৃপা প্রবাহের ক্ষরণহেতু অভিষিক্ত হইতেছে, সেই অশরণজনগতি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্বদা আমার গতি হউন। এই গুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সমগ্র লীলা, ঔদার্য্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বর্ত্তমান। আম্নায় ধারায় আগত শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমে শাস্ত্র অর্থাৎ ভাগবতী বাণী প্রকটিত। গুরুদেব শব্দের দ্বারে ও শাস্ত্রের দ্বারে ভগবানকে প্রকাশিত করেন। ভগবান্ শব্দ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত- প্রকটিত। গুরুদেব কর্ত্তৃক এই শাস্ত্র প্রকাশিত, কথিত, কীর্ত্তিত। তাঁর হৃদয় থেকে এই শব্দরূপী ভগবান্ উত্থিত। শ্রীগুরুদেবের মুখ, চোখ, নাক দিয়ে শাস্ত্রবাণী বহির্গত হয়। তাঁর নখাগ্র ও কেশাগ্র থেকে শাস্ত্র বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে। কৃষ্ণ আবির্ভাব তাঁর মধ্য দিয়ে নিরন্তর সংঘটিত হচ্ছে। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণময়। তাঁর আনখকেশাগ্র থেকে কৃষ্ণ আবির্ভাব হয়। তিনি যে তাকান, তিনি যে শোনান, তিনি যে চিন্তা করেন সবকিছুই কৃষ্ণকে নিয়ে করছেন।

'সর্বদেবময় গুরু' অর্থাৎ গুরুদেব ভগবন্ময়- কৃষ্ণ প্রেমময়। তাঁর সমগ্র সত্তায় তিনি কৃষ্ণকে নিয়ে আছেন। তাঁর জিহ্বায় কৃষ্ণ, হৃদয়ে কৃষ্ণ, চোখ, নাক, কান, নখ, ত্বকেন্দ্রিয়ে ও কেশে কৃষ্ণ আবির্ভূত হচ্ছেন। গুরুদেব তাঁর হৃদয়নাথ কৃষ্ণচন্দ্রকে শব্দরূপে ছড়িয়ে দিচ্ছেন, বাহিরে প্রকাশিত করছেন। শ্রীগুরুদেব শব্দরূপী কৃষ্ণকে আকার দান করছেন।

শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণই। কৃষ্ণই কৃষ্ণকে জানেন। জীব কৃষ্ণকে জানতে পারে না। গুরু জানালে জীব জানতে পারে। গুরু হচ্ছেন কৃষ্ণের প্রকাশ। কৃষ্ণের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। গুরু কৃষ্ণ হলেও গোপীনাথ নন। নন্দনন্দন, রাধা-বল্লভ, সুবল সখা বা রাধানাথ নন। গোপীগণ, নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-সুদাম, রক্তক-পত্রক, যমুনা-কদম্ব বৃক্ষাদি সব গুরু, গুরু কৃষ্ণকে সুখ দেন। অতএব গুরু। নিজে সুখ চান না। কৃষ্ণ হয়েও কৃষ্ণকে সুখ দেন। তিনি জীব জাতীয় নন। মর্য্যাদা মার্গে সকলের আকর শ্রীনিত্যানন্দ ভক্ত স্বরূপ, রাগপথে সকলের আকর বার্ষভানবী। শ্রীগুরু কৃষ্ণ দিতে পারেন, জীব বা মায়া কৃষ্ণ দিতে পারে না। জীব চেতন হলেও কৃষ্ণ নন। সুতরাং কি করে কৃষ্ণ দিবেন। শ্রীগুরুদেব নিত্য বস্তু। যদি গুরুদেব নিত্য না হন তা হলে তাঁর উপদিষ্ট বস্তুও তাঁর নিত্য সত্ত্বা, নিত্য চেতন ও নিত্য আনন্দ বা চিদ্ বিলাস রক্ষা করতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মই পরতত্ত্ব বস্তু। তিনি নিত্য পরতত্ত্ব সংশ্লিষ্ট। কিন্তু লোক মঙ্গলের জন্যই উপদেশক -সেবকরূপে তিনি প্রপঞ্চাতীত ধাম থেকে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। সেই গুরুদেব জীব বিশেষ নন, তাঁকে জীব মনে করলে অপরাধ হয়। তিনি জীবের প্রভু। জীব অপূর্ণ, খণ্ড, শ্রীগুরুদেব অখণ্ড, অদ্বয়জ্ঞান। জীব অনু, গুরু বিভু। যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই গুরু। গুরু- স্বরূপ শক্তি। কৃষ্ণ শক্তিমান্। শক্তিমান কৃষ্ণের যেমন বহুরূপ আছে, সকল রূপই যেমন কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হতে

অভিন্ন, ভিন্ন নন, স্বরূপ শক্তিরও সেরূপ বহুরূপ আছে। তারা সকলেই স্বরূপ শক্তি, সকলেই অভিন্ন, অখণ্ড, অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব বস্তু। পরতত্ত্বসংশ্লিষ্ট শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় স্বয়ংরূপের বিলাসের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। তাঁর সেবা সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রেমবাধ্য স্বয়ংরূপ নিত্যমুগ্ধ বশীভূত ও পরমাকৃষ্ট। তিনি অষ্টোত্তর শতশ্রী অর্থাৎ অষ্ট মুখ্যা (শ্রী) গোপীকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া শত (শ্রী) লক্ষ্মী অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ বিধানকারিগণের যুথের স্বরূপ যে আশ্রয় বিগ্রহে বর্ত্তমান সেই শক্তি আচার্য্যতত্ত্ব।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যসিদ্ধ শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ গোপী, নিরন্তর কৃষ্ণের সেবাসুখানুসন্ধানকারী। মাথার দ্বারা, বুদ্ধি-বিচারের দ্বারা জগদ্‌গুরুর দর্শন লাভ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ বিগ্রহের স্বপ্রকাশিকা শক্তি অবতীর্ণ হয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎকার করান। শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট নিত্যানন্দের নিন্দা প্রতিম উক্তি করে তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন--

"ঈষৎ হাসিয়া বলে শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমারে পরীক্ষ প্রভু এ নহে উচিৎ।।
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি-ধন-প্রাণ যদি মোর নাশ করে।।
তথাপি মোহার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিনু এই কথা।।"

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু যখন শ্রীল প্রভুপাদকে বললেন যে, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে কলির ব্রহ্মাণ্ড হতে গোদ্রুমে নিয়ে আসুন, তার উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ উত্তর দিয়েছিলেন,-" আপনি কি আমাকে পরীক্ষা করছেন? যদি আপনার পাদপদ্মের কৃপারেণু মাথায় ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করে থাকি, তাহলে আপনাদের

বঞ্চনা লীলার দ্বারা নিশ্চয়ই অভিভূত হব না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি কখনো একমুহূর্ত্তের জন্য শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যতীত অন্যত্র অবস্থান করেন, না আপনি শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যতীত অন্যত্র অবস্থান করছেন? কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা বিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী জীবগণের অবস্থা জানাবার জন্য আপনি যে পায়খানায় প্রবেশের লীলাভিনয় করছেন, আপনি যে পুরীষ পরিত্যাগের স্থানে প্রবেশ করেছেন তা দেখে আপনার পদরেণু কখনই বঞ্চিত হবে না।"

শ্রীল বাবাজী মহারাজ তখন শ্রীল প্রভুপাদকে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি আপনারা সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ প্রভু। শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভু ও আপনি যা করেন তা সমস্তই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ইচ্ছায় করে থাকেন। ক্ষুদ্র জীব আপনাদের কি ধারণা করতে পারবে? শ্রীগুরুপাদপদ্মে এইরূপ সুদৃঢ় নিষ্ঠাই থাকবে। মৎসর লোক এসব বুঝতে না পেরে অধঃপাতে চলে যায় – শ্রীনিত্যানন্দের অনুকরণ করে।" এটাই গুরুতে দেবতা বা ঈশ্বর বুদ্ধি। এর এক রতি কম হলে শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবদ্ভক্তের সন্ধান পাওয়া যাবে না। যিনি পূর্ণ শরণাগত হয়ে শ্রীহরিভজন অভিলাষী হয় তাঁর সামনে নিশ্চয়ই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অবতার হয়। বাস্তবিকপক্ষে যার শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ প্রেষ্ঠবুদ্ধির আবির্ভাব হয়েছে, তারই স্বাভাবিকভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রায় আত্মসমর্পণ করার সুবুদ্ধির উদয় হয় অথবা আত্মবুদ্ধি উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতায় আনুষঙ্গিকভাবেই শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় বিশ্বাস হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই যার আত্মা অর্থাৎ দেহ, গেহ, সর্বস্ব হতেও প্রিয়তম তিনিই গুরুদেবতাত্মা । নিজেকে গুরুপ্রেষ্ঠ বললে বা মনে মনে অভিমান করলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মবুদ্ধি বা প্রেষ্ঠবুদ্ধির উদয় হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে যিনি আত্মা অপেক্ষা প্রিয়জ্ঞান করে

তিনিই গুরুদেবতাত্মা। তাঁর সুখের জন্য কোটি কোটি প্রাণ এককক্ষণেই দান করতে প্রস্তুত তিনিই গুরুদেবতাত্মা।

কোটি কোটি প্রাণ করি যেন দান
তোমার সেবার তরে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হতে যিনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সুনাম, শান্তি, আরাম, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি দোহন করতে ইচ্ছা করেন তিনি গুরুদেবতাত্মা নয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে যার আত্মা অর্থাৎ প্রিয়তম বুদ্ধির উদয় হয়েছে তাঁর শ্রীগুরুদেবের কোন ব্যাপারেই প্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হয় না। "গোরার আমার সব ভাল" এই উপলব্ধি যার হৃদয়ে উদিত হয়েছে তারই গুরুতে আত্মবুদ্ধি হয়েছে। প্রিয়তমের কোন দোষ থাকতে পারে না। যাকে ভালবাসি তার দোষ চোখে পড়ে না। প্রীতির এতবড় ক্ষমতা। প্রিয়তা হতেই স্বাভাবিকভাবে এরূপ বুদ্ধির উদয় হয়। আর প্রিয়ের সুখানুসন্ধান করার জন্যই হৃদয়ে সর্বদা স্বাভাবিকভাবে আর্তি, উৎকণ্ঠার প্রকাশ হয়ে থাকে। প্রিয়ের সেবাও প্রতিপদে সুখরূপা বলেই অনুভূত হয়। শ্রীগুরুদেব আত্মা বা শ্রেষ্ঠ বলে তাঁর সুখানুসন্ধান স্মৃতিতে নিরবচ্ছিন্ন আবেশ স্বাভাবিক এবং তাঁর সেবাও সুখরূপা ও প্রগতিশালিনী। তাঁর জন্য কোন দুঃখ এমনকি প্রাণ ত্যাগ পর্যন্ত ক্লেশদায়কত'হয়ই না পরন্তু পরম সুখদায়ক হয়ে থাকে। এরূপ প্রিয়ত্ব থেকে হৃদয়বান্ শিষ্য বলেন,—

" তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরম সুখ।"

প্রেষ্ঠের জন্য যিনি ইহ জগতের প্রাণাপেক্ষা প্রীতির পাত্রকেও পরিত্যাগ করতে পারেন, তারই অন্তরে শ্রীগুরুদেবে প্রেষ্ঠ বুদ্ধি হয়েছে। গুরুপ্রেষ্ঠ হওয়া এটা দাম্ভিকতা আর শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রেষ্ঠবুদ্ধি এটা ভক্তির কথা। শ্রীগুরুদেবতাত্মা না হয়ে যারা শ্রীগুরুদেবের হৃদয় সর্বস্ব যে শ্রীমুকুন্দ তাঁর শ্রীচরণ লাভ করতে চায় তারা কোনকালে

মঙ্গল লাভ করতে পারে না।

শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ভূতলে অবতীর্ণ হন। এখানে এসে কৃষ্ণের সংসার পাতেন। তিনি কৃষ্ণের সংসারের সংসারী। তিনি সেবার factory খুলেছেন । তাতে বহুলোক সেবার সুযোগ পায়। যার ফলে অনেকে সেই সেবা factoryতে যোগদান করে নিত্য বাস্তব মঙ্গল লাভ করে। শ্রীগুরুদেবের সংসারে ঢুকে সেবা করলে নিশ্চয় তোমার মঙ্গল লাভ হবেই হবে। তোমার যা আছে অর্থাৎ কায়, মন, বাক্য, অর্থ, সামর্থ সব দিয়ে গুরুসেবা করতে হবে, তবেই সুবিধা হবে। তাহলে এই জীবনেই মঙ্গল লাভ হবে এবং সিদ্ধিলাভ হবে। এইসব মহাজনগণ আছেন বলে আজও পৃথিবীতে মঙ্গল খুঁজে পাওয়া যায়। এঁরা পৃথিবীর রত্ন, এঁরা আছেন বলে পৃথিবীতে শান্তি আছে। তা না হলে বিদ্বেষ হিংসায় ভরে যেত। এইসব রূপানুগ আচার্য্যগণকে ভগবান্ ভূতলে অবতরণ করান। তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলাকে জীবজগতের মাঝে ছড়িয়ে দেন। এঁদেরই কাছে স্নেহের কথা শুনতে পাওয়া যায়। ভগবান্ ভক্তের দ্বারে, বাণীর দ্বারে, আচরণের দ্বারে নিজেকে প্রকাশিত করেন । এটি তাঁর অপার করুণার কথা।

এইরূপ গুরুপাদপদ্মের সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধটাও হবে নিত্য মধুর। "গুরুদেবতাত্মা" সেবক বা শিষ্যের শ্রীগুরুপাদপদ্মে এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতি থাকবে।

" কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।"

'শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ দিতে পারেন অথবা তিনি আমাকে কৃষ্ণ দেবেনই দেবেন' এরূপ সুদৃঢ়তম বিশ্বাস শ্রীগুরুদেবে এলেই আমরা শিষ্য হবার যোগ্যতা অর্জন করলাম। আর যেখানে গুরুর প্রতি সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস সেখানে গুরুকরণ হয় নি। গুরুদেব আমাকে কৃষ্ণ

দিতে পারেন এ বিশ্বাস নেই অথবা হালকা হালকা ভাবে আছে তাতেও কৃষ্ণ পাওয়া যাবে না। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজন, গৌরপ্রেষ্ঠজন এ অনুভব না থাকলে গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি অবশ্যই আসবে। আর গুরুদেবতাত্মা শিষ্য সর্বক্ষণ গুরুপাদপদ্মের আদেশ, নির্দ্দেশ অনুসারে চলে। গুরুপাদপদ্মে সকল দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেন। নিজেকে গুরুপাদপদ্মে বিকিয়ে দেন।

শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা দিয়ে সম্বন্ধ জ্ঞান উদয় করিয়ে দেন। শিষ্য তখন গুরুর কাছে একটা দাবী করেন আর শ্রীগুরুদেবও তার দাবী গ্রহণ করেন । গুরুদেবের শিক্ষা গ্রহণ করে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। আমাদের শ্রদ্ধা সুপ্ত, লুপ্ত, গুপ্ত অবস্থায় আছে। সেই গুপ্ত শ্রদ্ধাকে তিনি জাগিয়ে তোলেন। তাঁর এরূপ গুরুত্ব দেখে শিষ্যের মাথা এমনিতে নত হয়ে যায় এবং নিজেকে তাঁর পাদপদ্মে বিলিয়ে দিতে সতত চেষ্টা করে। গুরুদেব আমাকে কৃষ্ণ-শ্রদ্ধা, কৃষ্ণ-রতি, কৃষ্ণ-প্রেমদান করবেনই করবেন। এরূপ বিশ্বাসবান্ সৎ সাধক "শ্রীগুরুতোষণই হরিতোষণ" বলে জানেন। তখন সে নিখিল ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে গুরুসেবাকে বেছে নেয়। আর গুরুসেবার দ্বারা ভগবানের প্রকৃত সুখবিধান জেনে উৎসাহ, ধৈর্য্য ও প্রীতির সঙ্গে নিরন্তর গুরুসেবা করে যায়। গুরুসেবা মানে, গুরুর সন্তোষবিধান করা, তাঁর কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ যজ্ঞে সাহায্য করা, তাঁর পছন্দমতো সেবা করা এরূপ করলে অতি অল্পকালের মধ্যে সিদ্ধিলাভ হয়। 'সংসিদ্ধির্গুরুতোষণম্।'

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর 'সজ্জনতোষণী ১৮/৫' এ 'শ্রীগুরুস্বরূপ' প্রবন্ধে বলেছেন,—"গুরুতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে ছয়তত্ত্বই ভগবান্; কিন্তু পরস্পর পৃথক। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ হইতে দাস রূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয়বস্তু। তিনি ভক্ত সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান

মনে করিলে তাঁহার খর্বতা করা হয়। গুরুদেব সন্ধিনী, হ্লাদিনী বা সম্বিৎ-শক্তি-মূলে নিত্য বিরাজমান; কেবল সম্বিৎ শক্তি পরিচয় তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে গেলে মায়াবাদী বা বাউল সহজিয়া মত হইয়া যাইবে।" শ্রীগুরুদেব শাস্ত্রবাণী নিরন্তর কীর্ত্তন করেন। শ্রীগুরুধারায় আবির্ভূত শ্রীগুরুদেব ব্যতীত অন্য কেউ যথাযথভাবে কীর্ত্তন করতে পারেন না। শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীশ্যামসুন্দরের প্রিয়জন-নিজজন। তিনি পূর্ব মহাজনগণের আনুগত্যে ও তাঁদের পদাঙ্কানুসরণ করে যথার্থ বাস্তব সত্যের উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীগুরুদেবের আচরণই শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত। গুরুপরম্পরায় আগত শ্রৌতবাণীই শাস্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীগুরুদেব – আদর্শ ভক্ত ভাগবত। সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাণী একসূত্রে গাঁথা– পরস্পর এক মহান ঐক্যতানে বিজড়িত। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহযোগে এই সুমধুর ঐক্যতান সুনির্মল আত্মার সেবোন্মুখ প্রবৃত্তিতে অনুভূত হয়।

"সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।"

গৌড়ীয় ভক্তগণ -কেবলাভক্তির সাধকগণ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ভজন সাধন করেন এবং নিত্যকাল প্রেমসেবামৃতরসে নিমজ্জিত হন। সদ্গুরু বরণই শ্রৌতপন্থায় ভজনের একান্ত প্রয়োজন। যারা শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবামৃতরসে ডুবতে ইচ্ছুক- সেরূপসুদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছেন - তারা সর্ব প্র[illegible]মে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কাছে অকপটে কেঁদে কেঁ[illegible] [illegible]ার্থনা করলে মহাকরুণার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁকে গুরুপর[illegible]ায় আবির্ভূত গুরু[illegible]পাদপদ্মে নিয়ে যাবেন। যিনি [illegible] অর্থাৎ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন স্বরূপ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত [illegible] সদ্গুরু।

"চৈতন্যলীলামৃতপূর কৃষ্ণলীলা [illegible]পূরি
দুঁহে মিলে হয় সুমাধুর্য্য।

সাধু গুরু প্রসাদে   তাহা সেই আস্বাদে
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য।।"

"কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ববিদ্যাবিশারদঃ।।
সর্বসংশয়সংছেত্তানলসো গুরুরাহৃতঃ।।"

অপার কৃপাময়, সুসম্পূর্ণ (অর্থাৎ যিনি স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া যাঁহার কোন অভাব নাই), সর্ব্বগুণ বিশিষ্ট, সর্ব্বজীবের হিতসাধনে রত, নিষ্কাম, সর্ব্ব প্রকারে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং শিষ্যের সর্বসংশয় ছেদনে সমর্থ ও অনলস অর্থাৎ সতত শ্রীহরিসেবা নিষ্ঠ পুরুষই গুরু বলিয়া কথিত হন। এরূপ গৌরপ্রেষ্ঠ মহাজনই, রূপানুগ আচার্য্যগণই জীবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দান করতে সমর্থ। এখন জীবের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল- কে ই বা রূপানুগ আচার্য্য ? আর রূপানুগাচার্য্যকে চেনা যাবে কি করে? সকলেই তো বলছেন, আমি রূপানুগাচার্য্য। আমার কাছে এস, আমার কাছে এসে ভজন শিক্ষা কর। আমি তোমাদের শ্রীরাধা-গোবিন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা পাইয়ে দিব। সাধকগণকে এই মহা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা, কোনটা আসল, কোনটা নকল তা ধরতে পারা সত্যই সুকঠিন ব্যাপার। এ অবস্থায় আমরা অনেক সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। প্রচারের চাকচিক্যে, ঐশ্বর্য্যের ঘনঘটায়, propaganda র দামামায় আমাদের চিত্ত বিকল হয়ে যায়, বিহ্বল হয়ে যায়। আমরা যথার্থ সত্যের অনুসন্ধান করতে পারি না। এর মধ্যে যে সমস্ত সাধক ধীর স্থিরভাবে রূপানুগ গুরুবর্গের পদরেণু লাভের জন্য নিরন্তর নিষ্কপট শ্রীগৌর-কৃষ্ণের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাবেন। অনুক্ষণ কাতব ক্রন্দন করবেন শ্রীগৌরসুন্দর তার কাছে নিরস্তকুহক বাস্তবসত্যের আলোক নিশ্চয়ই প্রতিভাত করবেন। শ্রীগৌরচরণে নিষ্কপট প্রার্থনা ও অশ্রু

বিসর্জন ছাড়া রূপানুগ আচার্য্যগণের সন্ধান পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরসুন্দরের বিশেষ কৃপাতেই সরল চিত্ত সাধক যথার্থ রূপানুগ গুরুধারাকে বরণ করার সৌভাগ্য লাভ করে। যারা সত্যের সন্ধানে নিজস্ব স্বসুখ জলাঞ্জলি দিয়েছেন। শ্রীগৌরপাদপদ্মে প্রেম সেবা লাভের জন্য যারা নিয়ত আত্মনিবেদন করছেন, কেবলমাত্র তারাই রূপানুগ গুরুবর্গকে চিনতে পারবেন। শ্রীরূপানুগ আচার্য্যবৃন্দের মহান বিপ্রলম্ভময় ভজনাদর্শ আমাদের হৃদয়ে যেদিন অনুসরণের স্পৃহা জাগ্রত হবে সেদিন আমরা নিত্য বাস্তব মঙ্গলের কথা বুঝতে পারবো, নিত্য বাস্তব মঙ্গল বরণ করতে পারবো।

এখন আমাদের একান্ত জানা দরকার যে, কিভাবে আমরা এই রাধাজনের অর্থাৎ শ্রীরূপানুগাচার্যের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করবো ? এই আত্মসমর্পণের মধ্যে ভজনের নিগূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে কিন্তু আমরা যদি এই আত্মসমর্পণ করতে না পারি বা কার্পণ্য দেখাই বা আত্মসমর্পণ করার জন্য যত্ন, অধ্যবসায়, আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা না জাগে তবে এই পৃথিবীর বুকে রাধাজন প্রকট লীলা করলেও আমরা তাঁর সন্ধান পাব না। এমনকি সেই রূপানুগাচার্যের কাছে নাম, মন্ত্র, দীক্ষা গ্রহণের অভিনয়, দীর্ঘদিন মঠবাসের অভিনয়, দীর্ঘদিন বহু নিপুণতা সহকারে কর্মদক্ষতা বা বক্তৃতার দ্বারাও রাধাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন বা আত্মসমর্পণ না করার জন্য যথার্থ মঙ্গল লাভ করতে পারি না। যথার্থ মঙ্গল লাভ করতে পারি না কেন -- কারণ আমাদের সর্বনাশা গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি বর্ত্তমান। আমাদের হৃদয় প্রচুর পরিমাণে পুরুষাভিমানে মত্ত থাকার জন্য অপ্রাকৃত প্রেমিক প্রবর শ্রীগুরুপাদপদ্মকে প্রাকৃত ভূমিকায় দর্শন করি। তিনি আমার মতো মর্ত্ত্যবাসী মরণশীল জীবমাত্র বা আমার থেকে কিছুমাত্র উন্নত। আর যদিও কখনো শ্রীগুরুপাদপদ্মে সামান্য শ্রদ্ধার অভিনয় করি - তাতে কায়, বাক্য দিলেও মনটা ষোল আনা দিই না। যার ফলে প্রকৃত সাধুর

কাছে এসেও মঙ্গল বরণ করতে পারি না। কি জন্য হরিনাম নিলাম? কি জন্য গুরুপাদাশ্রয় করলাম? আমার প্রয়োজন কি? আর প্রয়োজন প্রাপ্তির জন্য আমাদের কি করণীয় এ বিষয়ে আমাদের চিত্তে একটুও ভাবনা চিন্তার অবকাশ হয় না। শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ সেবার আশা হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকলে জীব অবশ্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করবে। সাধকের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শিক্ষামৃত আচরণই ভজন। তা না হলে আমরা হরিনাম, মঠবাস, লালকাপড়, সন্ন্যাসাদি গ্রহণ করেও মূল বিষয় হতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাই। এর কারণ হলো-অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির সুদৃঢ় আশা নেই। কোন কারণ বশতঃ বা সামান্যতম সুকৃতির ফলে এরূপ মহাজনের কাছে এসে পড়ে ছি কিন্তু পুঞ্জীভূত 'সদ্ভক্তিবাসনা' নেই। তাই আমাদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি সুদূর পরাহত। মহাবদান্য শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দর করুণাবশতঃ আত্মসমর্পণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির সহজতম উপায় বললেন, – শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে

" দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়।।"

শ্রীগৌরসুন্দর এই কয়েকটি লাইনের মধ্যে জীবের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন সম্পর্কে বলেদিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম থেকে সাধক দীক্ষা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করার পরে অভিধেয় যাজন করেন অর্থাৎ অহৈতুকী আত্মসমর্পণ করতে থাকেন। আত্মসমর্পণ হলে কৃষ্ণ সেই সাধককে আত্মসম বা চিদানন্দ বা অপ্রাকৃত করেন। এইখানে 'আত্মসম', 'চিদানন্দময়', এবং 'অপ্রাকৃত দেহ' তিনটি শব্দ বলার গূঢ়রহস্য আছে। তিনটি শব্দই একই তাৎপর্য্যপূর্ণ অথচ তিনবার প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে সাধক সম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয়

যাজন করেন অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করার প্রথম অবস্থা আত্মসম থেকে আত্মনিবেদনের পূর্ণ অবস্থা অপ্রাকৃত দেহ প্রাপ্তিকে বুঝাচ্ছে। পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে সাধকের বেশ কিছুকাল সময় লাগে। সেজন্য তিনটি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। সেইকালে অর্থাৎ দিক্ষাকালে বা সম্বন্ধ উদয় হলে অপ্রাকৃত ভূমিকা আরম্ভ হল। অপ্রাকৃত দেহেই শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের চরণ সেবাই রাধাদাসীর চরম ও পরম প্রয়োজন।

শ্রীল প্রভুপাদ এই পয়ারের অনুভাষ্যে লিখেছেন,--

"দীক্ষাকালে ভক্ত নিজ প্রাকৃত অনুভূতি সমূহ সমর্পণ করিয়া অপ্রাকৃত সমন্ধ জ্ঞান বিশিষ্ট হন। অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অপ্রাকৃত স্বরূপে কৃষ্ণ সেবা অধিকার প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণেতর মায়্যার আশ্রয়চ্যুত হইলেই প্রপন্নভক্তকে আত্মসাৎ করেন। তখন তাহার জড় ভোগরাজ্যের ভোক্তা বলিয়া জড়ীয় অভিমান দূর হয় এবং নিজাস্মিতায় নিত্য কৃষ্ণ দাস্য স্ফূর্ত্তি ঘটে। তখন ভক্ত সচ্চিদানন্দময় স্বীয় স্বরূপে নিত্য সেবক বিগ্রহত্ব উপলব্ধি করিয়া অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাধিকারী হন। ভক্তের তৎকালোচিত অপ্রাকৃত দেহ দ্বারা অপ্রাকৃত ভাবসেবাকেও প্রাকৃত বুদ্ধি দোষে কর্ম্মিগণ তাহাদেরই ন্যায় ভোগপর প্রাকৃত কর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করে; সেই অপরাধক্রমে তাহারা অপ্রাকৃত গুরুর কৃপালাভে বঞ্চিত হয়। এ সম্বন্ধে শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলেছেন,-

"কৃষ্ণভক্তিসুধাপানাদ্দেহদৈহিকবিস্মৃতেঃ।
তেষাং ভৌতিকদেহেহপি সচ্চিদানন্দরূপতা।"

(বৃঃভা: ১/৩/৬১)

"ভক্তানাং সচ্চিদানন্দরূপেষ্বঙ্গেন্দ্রিয়াত্মসু।
ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুণ্ঠেহন্যত্র চ স্বতঃ।।"

(ঐ -- ২/৩/১৩৯)

ভক্তিদেবী উদিত হলে পাঞ্চভৌতিকদেহও সচ্চিদানন্দরূপই প্রাপ্ত

হয়ে থাকে। সাধন ভক্তি বা সম্বন্ধ উদিত হলে দেহ অপ্রাকৃত হতে আরম্ভ করে। এতে যদি মনে সন্দেহ জাগে যে, সাধক ভক্তের পাঞ্চভৌতিক দেহ ও মন বুদ্ধি কিরূপে সচ্চিদানন্দ হয়? বলছি শ্রবণ কর। সাধ্য ভক্তের কৃপায় সাধক ভক্তের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে ভক্তির আবির্ভাব হয়ে থাকে। যেমন, স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ সুবর্ণে পরিণত হয় তদ্রূপ সাধকের প্রাকৃত দেহাদিও অপ্রাকৃত হয়ে যায়। শ্রীভগবানের করুণা শক্তি বিশেষই সচ্চিদানন্দরূপতায় পর্য্যবসিত হয়ে থাকে। "কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম"--শ্রীকৃষ্ণ করুণাবশতঃ সাধককে অপ্রাকৃত ভূমিকায় অপ্রাকৃত দেহ দান করেন। কি করে এটা লাভ হবে। শ্রীরূপানুগাচার্যগণের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি অভিমানে স্থিত হয়ে নিরন্তর শ্রীনামের নিকট কৃপা লাভের জন্য অকপট ক্রন্দন করতে হবে।

"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
'ভক্তি' এই কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন।।"
(শ্রীচৈ:ভা:ম:-- ২৪/৭২)

হৃদয়ের নিষ্কপট প্রচুর অশ্রুজল ব্যতীত তাঁদের দর্শন ও সেবা লাভ হয় না। প্রচুর আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা ও আকুল ক্রন্দনই সেই বস্তু লাভের একমাত্র উপায় বলে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেছেন। অদর্শন জনিত প্রবল অশ্রু এবং অসামান্য দৈন্যই সেই সুদুর্গম গিরিপথের সেতু। অসাধারণ দৈন্য উদিত হলে নিজের অযোগ্যতা বা 'পুরীষের কীট' এই পয়ারের আচরণ হবে। সেইসঙ্গে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ্ব রূপানুগত্ব মহিমা উপলব্ধি হবে। তখন তাঁকে পাওয়ার, তাঁর সেবা করার, তাঁর কাছে যাওয়ার লালসা জাগবে। যতই এই লালসা জাগবে ততই হৃদয় বিগলিত হয়ে নেত্র দ্বারে প্রবল অশ্রু গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের পদকমলকে অভিষিক্ত করবে। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস অঙ্গনে

সংকীর্ত্তনে, রথ যাত্রায়, ঝারিখণ্ডের বনপথে, গম্ভীরার প্রাঙ্গণে, সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ অদর্শন জনিত বিরহ ব্যাথায় অশ্রুজলে পৃথিবী সিক্ত করেছেন। শ্রীরূপানুগ আচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান এইভাবে করেছেন। এই সকল বিপ্রলম্ভ বিভাবিত, দিব্যোন্মাদে বিভাবিত গুরুবর্গের শ্রীচরণাশ্রয় করলে আমাদের আত্মাটাও শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানে প্রবল বেগে ধাবিত হয়, তখন এইজন্মেই শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে। সেই সুদুর্লভ প্রেম লাভের জন্যই প্রপঞ্চে সদ্‌গুরুর আবির্ভাব।

"জনম সফল তাঁর, কৃষ্ণ দরশন যা'র
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকশিয়া হৃন্নয়ন, করি কৃষ্ণ দর্শন
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার।।"

শ্রীল গুরুদেব শিষ্যের পূর্ব্বাজন্মার্জ্জিত কামনা-বাসনা, পাপরাশিসমূহ সমূলে উৎপাটন করে চিত্তদর্পণকে পরিমার্জিত করে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ মহাপ্রেম, প্রেমের পরাকাষ্ঠা সঞ্চার করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ মহাশক্তি সঞ্চারিত হৃদয়ে জীব কৃষ্ণ দর্শন করে কৃত কৃতার্থ হয়। শ্রীরূপানুগ আচার্য্যগণ মঞ্জরী-ভাব-মাধুর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহানিধি আচার ও প্রচার করে জীবকে দান করতে কুশলী।

"মঞ্জরী ভাব মাধুর্য্যঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহানিধি।
আচার প্রচার দানে চ কুশলো গুণীনাং বর।।"

শ্রীশ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধনক্রিয়া ও সাধনভক্তির পরস্পর সম্বন্ধ ও পার্থক্য

সাধনক্রিয়া

* **শ্রীরূপানুগ** শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করে নিষ্কপট চিত্তে সরলপ্রাণে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শরণাগতভাব নিয়ে স্বরূপের অভিমান নিয়ে অন্তর্মুখ হয়ে ভক্তিপ্রতিকূল ইতরাভিলাষ সমূহ অর্থাৎ পুরুষাভিমান বা ভোক্তাভিমান পরিত্যাগ করার দৃঢ় যত্ন ও চেষ্টা নিয়ে শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের অহৈতুকী কৃপা ও প্রেমসেবা লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে এই জড়দেহ- মনের দ্বারা নিরপরাধে শ্রবণ কীর্ত্তন সেবাদি নবধা ভক্ত্যঙ্গ যাজন করা হয় তাকে সাধন বলে।

* জড় অভিমান দূর করে আত্মস্বরূপ উপলব্ধির যে চেষ্টা তাকে সাধন ক্রিয়া বলে।

* নিষ্কপট আর্ত্তির সঙ্গে কৃষ্ণৈকশরণ সাধুর নিকট প্রপন্ন হয়ে তাঁর শ্রীমুখে সম্বন্ধ জ্ঞানের বিষয় শ্রবণ পূর্বক তা উপলব্ধি করার

যত্ন হলেই সাধন ক্রিয়া হয়।

* সাধন ক্রিয়ার মূল বস্তু হল শ্রদ্ধা।

* অনর্থ নিবৃত্তির জন্য এবং স্বরূপ উপলব্ধির জন্য সাধন ক্রিয়া।

* সাধন ক্রিয়ার দ্বারা আত্মার জাগরণ হয় মাত্র।

* সাধন ক্রিয়া দেহ-মনের উপর হয়। আত্মার উপর এর কোন ক্রিয়া নেই।

* ভক্তিদেবীকে প্রসন্ন করার জন্য অর্থাৎ তাঁদের কৃপা লাভের জন্য নিষ্কপট চিত্তে জড়দেহ চেষ্টা দ্বারা যে ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানের যত্ন তাই সাধন ক্রিয়া।

* এই ভক্তি শক্তি অবতরণের জন্য হ্লাদিনী বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে ও সম্বিৎ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কৃপা প্রার্থনা মুখে ভক্ত্যঙ্গ যাজনই সাধন ক্রিয়া।

* সাধন ক্রিয়া কালাধীন, কেবল হরিবিমুখতা নাশ করা জন্য সাধন ক্রিয়া। হরিবিমুখতা নাশ হলে অর্থাৎ অনর্থ অপগমে সাধন ভক্তি স্বঃতই প্রকাশিত হয়।

* নিষ্কপট দৈন্য, সুখানুসন্ধানবৃত্তি এবং ফলকামনা শূন্য হলে সাধন ক্রিয়া হবে।

* অন্তর্মুখ মনে স্মরণই সাধন ক্রিয়া। সাধন ক্রিয়াতে যে ধ্যান হয় তা বার্ত্তান্তর গন্ধযুক্ত ও ক্ষণিক হয়ে থাকে।

* জড় অভিমান যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণই সাধন ক্রিয়া চলতে থাকে।

* সাধন ক্রিয়াতে অহন্তা ও মমতা ব্যবহারিক বিষয়ে পূর্ণ থাকে। পরমার্থ বিষয়ে স্বল্প হয়ে থাকে।

* লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা শূন্য হয়ে ভক্ত্যঙ্গ যাজন করলে সাধন ক্রিয়া হয়।

* শরণাগতির পূর্বে সাধন ক্রিয়া হয়ে থাকে।

সাধন ভক্তি

* শ্রীগুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে যখন আমাদের অভিমান পরিশুদ্ধ হয় তখন শ্রীগুরু-কৃষ্ণ প্রসাদ আমাদের শুদ্ধ আত্মার বৃত্তির স্বরূপ বা চেতন ধর্মের রূপ বলে জানতে পারা যায়। তখন শ্রীগুরু কৃষ্ণের কৃপাপেক্ষা দ্বারা নিত্যসিদ্ধ সেবায় ভাব প্রকটনের জন্য যে আত্মগত চেষ্টা হয় তাই সাধন ভক্তি। অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রকটন যার দ্বারা হয় তাই সাধন ভক্তি।

* আত্মবৃত্তি দ্বারা চালিত মন ও ইন্দ্রিয় বা আত্মস্বরূপ উপলব্ধির পর আত্মানুগত মন ও ইন্দ্রিয় যে ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করে তার দ্বারা আত্মগত নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রকটনের নামই সাধন ভক্তি।

* অনর্থ নিবৃত্তির পর এবং স্বরূপ উপলব্ধির পর নিত্যসিদ্ধ ভাব প্রকটনের জন্য সাধন ভক্তি।

* সাধন ভক্তি অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় বা সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধিত হয়।

* সাধন ভক্তি হতে শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে আত্মার অভিসার আরম্ভ হয়।

* সাধন ভক্তি আত্মার উপর হয় অর্থাৎ সাধন ভক্তি আত্ম ভূমিকায়

নিত্য ক্রিয়াবতী।

* ভক্তিদেবীর কৃপাতে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব অবতরণের পর যে সাধন অনুষ্ঠান হয় তাই.সাধন ভক্তি। চিত্তশুদ্ধ হলে ভগবৎ সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা এসে যায়। সুতরাং শ্রীগুরু কৃপাই সাধন।

* হ্লাদিনী সার সমবেত সম্বিৎ শক্তি অবতরণে সাধন ভক্তি আরম্ভ হয়।

* সাধন ভক্তি নিত্য আত্মার নিত্য বৃত্তি বা স্বভাব। আত্মবৃত্তিতে সাধন ভক্তি প্রকাশিত হলে জীব ক্রমে ভাব ও প্রেমভক্তি লাভ করে। ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি সাধন ভক্তির পরিপক্ক অবস্থা।

* সাধন ভক্তির আরম্ভেই সকল ক্লেশ অর্থাৎ পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যাদি বিনষ্ট হয়ে যায়। এবং সকল সুমঙ্গলের উদয় হয়। শুদ্ধ ভক্তি উদয়েই হৃদয়ে অপ্রাকৃত দৈন্য, মানশূন্যতা, অপরকে মানদান প্রভৃতি সদ্‌গুণের উদয় হয়।

* নিরবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণে মনোভিনিবেশই সাধন ভক্তির লক্ষণ। অর্থাৎ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিরন্তর প্রীতিময়ী আবেশময়ী সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি থাকবে। ধ্যান, ধারণা, ধ্রুবানুস্মৃতি পর্য্যন্ত সাধন ভক্তি। ঐ অবস্থায় ধ্যান বার্ত্তান্তর গন্ধশূন্য ও গাঢ় গাঢ়তর হতে থাকে।

* সাধন ভক্তিতে পরমার্থ বিষয়ে বৃত্তি প্রবল ও ব্যবহারিক বিষয়ে গন্ধমাত্র থাকে।

* দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব সম্বন্ধ নিয়ে ভক্ত্যঙ্গ যাজনই সাধন ভক্তি।

* সাধন ভক্তিতে জড় অভিমান থাকে না। স্বরূপ অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

* শরণাগতির পর সাধন ভক্তি হয়ে থাকে।

** জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, -- সাধন ভক্তি ও সাধন ক্রিয়ার পরস্পর সম্বন্ধ ও ভেদ বুঝিতে না পারায় জগতে নানা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনাম

"শ্রীনাম চিন্তামণিঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।"

শ্রীভগবানের নাম দু'-প্রকার। (১) মুখ্যনাম (২) গৌণনাম।
১) মুখ্যনাম - শ্রীভগবানের চিজ্জগতে যে মায়িক কাল ও দেশের অতীত নাম সকল নিত্য বর্ত্তমান। সে সকল নামই চিন্ময় ও মুখ্যনাম। রাম, কৃষ্ণ, হরি, নারায়ণ ইত্যাদি। গুণবাচক, রূপবাচক, লীলাবাচক ও পরিকর বাচক নাম আছে। যতসব মুখ্যনাম আছে তার মধ্যে কৃষ্ণনামই সর্বোত্তম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

২) গৌণ নাম গুণ সম্বন্ধীয় নাম। যেমন- সৃষ্টিকর্ত্তা, জগৎপিতা, বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বপালক, পরমাত্মা প্রভৃতি বহুবিধ গৌণ নাম। গৌণ

* গুণকীর্ত্তনে আসক্তি ও তদ্‌বসতিস্থলে প্রীতি।

শুদ্ধনামের লক্ষণ ঃ

একবার যাঁর মুখে শুদ্ধনাম উচ্চারিত হন, তাঁর চরিত্রহীনতা থাকতে পারে না। গুরুগিরি করবার দুষ্প্রবৃত্তি তাঁর থাকতে পারে না। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা তাঁর হৃদয়ে স্থান পায় না, শ্রীনামের আভাসেই পাপ, পাপবাসনা ও অবিদ্যা নষ্ট হয়ে থাকে। তিনটির কোনও একটি অন্তঃকরণে থাকলে শুদ্ধনাম একবারও উচ্চারিত হয় নাই জানতে হবে।

সাধু-গুরু কৃপায় নিজেকে শ্রীনামের সেবক বলে জানবার সৌভাগ্য হলে প্রতিষ্ঠালাভের ইচ্ছা জাগে না, কনক-কামিনী ভোগের স্পৃহাও থাকে না। কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠার কবল হতে যিনি মুক্ত হয়েছেন, তাঁর মুখেই শুদ্ধনাম উচ্চারিত হন।

আদৌ স্ত্রী-সঙ্গ স্পৃহা শূন্যতা, সর্বজীবে পূর্ণ দয়া, অর্থ ব্যবহারে তুচ্ছজ্ঞান, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ জন্য অভাবকালে যত্ন, কৃষ্ণে শুদ্ধারতি, বহির্ম্মুখ সঙ্গে তুচ্ছ জ্ঞান, মান-অপমানে সমবুদ্ধি, বহ্বারম্ভে স্পৃহা শূন্যতা, জীবনে মরণে রাগ-দ্বেষ রাহিত্য।

যার জিহ্বায় শুদ্ধনাম উচ্চারিত হয় তার – (ক) মহতের শ্রীপাদপদ্মে আদরভরা দৈন্য, (খ) চক্ষুতে অকপট অশ্রু, (গ) শ্রীহরিনামে রুচি, (ঘ) সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্ব পাত্রে সর্ব্বস্বদ্বারা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সুখানুসন্ধানময়ী সেবা স্মৃতি উদিত হবে। যেখানে আত্মসুখানুসন্ধানের বিন্দুমাত্র গন্ধও আছে, সেখানে জিহ্বায় শুদ্ধনাম উচ্চারিত হয় নি জানতে হবে।

"নিরপরাধেন হরিনামকৃতং, বিষয় বিরক্তি জনিত দৈন্যং নির্ম্মৎসরতালংকৃতা দয়া, মিথ্যাভিমান শূন্যতা, সর্ব্বেষাং যথাযোগ্য-সম্মাননা চৈতানি লক্ষণানি।"

শুদ্ধনামের ফল –

শ্রীহরিনাম করলে চিত্ত নির্ম্মল হয়, সর্বভক্তি সাধন উদ্গাম, ভক্তিকুসুম প্রস্ফুটিত হয়, কৃষ্ণ প্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে নিমজ্জিত, কৃষ্ণসেবামৃতে অভিষিক্ত হয়। শ্রীভগবানের সেবা পরাকাষ্ঠা লাভ হয়।

"এক কৃষ্ণনাম করে সর্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।।
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প পুলক গদগদাশ্রুধার।।
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন।।"

নামাভাস –

* অপরাধ মুক্ত অবস্থায় এবং নাম ভজনের যোগ্যতা রহিত সম্বন্ধ জ্ঞান শূন্য যে নাম তাই নামাভাস।
* প্রপঞ্চ ও বৈকুণ্ঠের মধ্যবর্ত্তী স্থানে নামাভাস।
* নাম উদয়ের পূর্ব অবস্থা নামাভাস।
* অপরাধ শূন্য শুদ্ধ স্বরূপ জ্ঞান রহিত যে ভগবৎ নাম উচ্চারণ 'তাহা নামাভাস।
* নামাভাস বিষয় বাসনা মুক্ত অবস্থা অর্থাৎ তটস্থ অবস্থা।
* শাস্ত্রে দশটি অপরাধের কথা আছে তা' যদি সরলতা বা অজ্ঞতাহতে হয়, তখন যে নাম উচ্চারণ হয় তা নামাভাস।
* যে পর্যন্ত শ্রীগুরু কৃপায় সম্বন্ধ জ্ঞানোদয় না হয়, সে পর্যন্ত জীবের অজ্ঞান অনর্থ থাকে; সুতরাং সে পর্যন্ত যে নাম উচ্চারণ করা যায়

* যিনি সেবোন্মুখ হয়ে কৃষ্ণ ভোগ্য অভিমানে শ্রীনাম করেন, ভোক্তা শ্রীনাম কৃপা পূর্বক তাঁর হৃদয়ে উদিত হবেনই হবেন।

* শ্রীনাম যাঁর বশীভূত, সেই স্বরূপ শক্তির কৃপা ব্যতীত শ্রীনামের কৃপা হয় না। শ্রীগুরুদেব স্বরূপ শক্তি। শ্রীগুরুদেবকে হৃদয়দেবতা জেনে যিনি শ্রীগুরুদেবকে হৃদয়ে বরণ ও ধারণ করেন, শ্রীগুরুদেবের নিত্যসঙ্গী শ্রীনামও তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে যান। অর্থাৎ শ্রীনাম তাঁর হৃদয়ে উদিত হন।

* শ্রীগোলোক বৃন্দাবনবাসী জীবাত্মার শুদ্ধজ্ঞানময়, সেবাময় রূপ বড়ই সুন্দর। সেই সৌন্দর্য্যময়, শুদ্ধজ্ঞানময়, সেবাময়, আনন্দময়, চেতনময় শুদ্ধজীব যখন সব অঙ্গের দ্বারা নাম করেন তখন নাম কান্তরূপে তাঁর নিকট উদিত হন।

* শ্রীনামের অহৈতুকী সেবক অভিমান হলে শুদ্ধনাম হবে।

* যুক্ত বৈরাগ্যবানই শ্রীহরিনাম ও শ্রীহরির সাক্ষাৎ করেন। অর্থাৎ শুদ্ধনাম করেন।

* যেখানে শ্রীনামের সুখকরী অহৈতুকী সেবাবাঞ্ছামূলে নাম উচ্চারণ সেখানে শুদ্ধনাম হয়।

* শ্রীনাম গ্রহণের সময় যেখানে শ্রীনাম এবং স্বরূপ শ্রীনামীতে অভেদ উপলব্ধি এবং সম্বন্ধ জ্ঞানের সঙ্গে নাম গ্রহণ হয় সেখানে শুদ্ধনাম হয়।

* অন্যাভিলাষিতা শূন্য ও জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্যভাবের সঙ্গে নাম করলে শুদ্ধনাম হয়। নামের চিন্ময়ভাব স্পষ্ট উদয় করে পরমানন্দ অনুভবের যে অভিলাষ তা অন্যাভিলাষ নয়। তা ছাড়া নাম দ্বারা পাপক্ষয়, মোক্ষবাঞ্ছাদি যত প্রকার অভিলাষ আছে সে সমস্তই অন্যাভিলাষ। প্রাতিকূল্যভাবকে হৃদয় হতে সম্পূর্ণরূপে দূর করে কেবল নামের অনুকূল প্রবৃত্তির সঙ্গে যে নাম আলোচনা বা নাম গ্রহণ তা শুদ্ধনাম। নামাপরাধ ও নামাভাস শূন্য নামই শুদ্ধনাম।

* সরলতাপূর্ণ হৃদয়ে, চিন্ময় নয়নে, সেবোন্মুখ জিহ্বায়, শ্রবণোন্মুখ কর্ণে, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামূলা ইন্দ্রিয়গণে অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীনাম প্রভু উদিত হন।

* শ্রীনামের স্বরূপ, শ্রীনামী কৃষ্ণের স্বরূপ ও নিজের স্বরূপ অবগত হলে শুদ্ধ নাম হয়।

* চিৎকণ স্বরূপ জীব শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থিত হয়ে তার চিন্ময় শরীরে শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করেন। হ্লাদিনী কৃপায় স্ব-স্বরূপের যে সময়ে ক্রিয়া হয় তখনই তাঁর নাম উদয় হয়।

শুদ্ধনাম উদয়ের লক্ষণ ঃ—

* শ্রীহরিনাম ভোক্তা, আর জীব ভোগ্য। ভোক্তার সঙ্গে ভোগ্যের সংস্পর্শে চিত্তে বিকার হবেই হবে। অর্থাৎ যে ভাগ্যবানের সেবোন্মুখ জিহ্বায় শুদ্ধ হরিনাম উদিত হন, তাঁর চিত্তে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হয়। তৎসঙ্গে ভাবের নয়টি লক্ষণ উদিত হয়।

* যাঁর নামে রতি উদিত হয়েছে বা শ্রীনামপ্রভু যাঁর জিহ্বায় উদিত, তার মধ্যে এই নয়টি লক্ষণ দেখা যায়।

* তার ক্ষান্তি অর্থাৎ জাগতিক কোন ক্ষোভেব কারণ হলেও চিত্ত অক্ষুব্ধ থাকে।

* অব্যর্থকালত্ব – ২৪ঘন্টার মধ্যে ২৪ ঘন্টাই সেবাযুক্ত।

* বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়ে স্বাভাবিকী অরোচকতা।

* মানশূন্যতা।

* আশাবন্ধ, অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃঢ় সম্ভাবনা।

* সমুৎকণ্ঠা, নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রীতি লাভের অত্যন্ত লোভ।

* নামগানে সদারুচি।

নামে বহুবিধ ফল থাকলেও প্রেম উদয় করায় না।

শ্রীনাম সাক্ষাৎ নামী অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। নাম অপ্রাকৃত, চিন্ময়, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, অখণ্ড চিন্তামণি বস্তু। কেবল জীবের নাম গ্রহণের তারতম্যানুসারে শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ ভেদ হয়ে থাকে। জড়ের চিন্তা থাকলে শুদ্ধনাম হয় না। সেবোন্মুখ না হলে-কৃষ্ণোন্মুখ না হলে কৃষ্ণনাম কি করে হয়? যিনি ভোগী, যিনি কপটতা করেন, যিনি শঠতা করেন, তার মুখে হরিনাম হয় না। নাম ও নামী অভিন্ন এ বিচার যাদের নাই, তাদের নামে বাধা হবে। সেবোন্মুখ হলে নাম আরম্ভ হয়। নাম সাক্ষাৎ ভগবান্- ইহা স্মৃতি পথে না থাকলে নাম কি করে উদিত হবে? বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত প্রবল থাকলে বৈকুণ্ঠনাম হয় না। মন চিন্ময় বা শুদ্ধ না হলে হরিনাম হয় না। যার বিশ্বদর্শন-ভোগ্য দর্শন ধ্বংস হয়েছে, তারই নিরন্তর হরিনাম হয়।

বাসনার দাস হওয়ার জন্য আমাদের এত দুঃখ। অনিত্য বা প্রার্থনা বা কামনা প্রবল হলে কামনার দাস হয়ে ভূত-প্রেত হতে হবে। গুরু-কৃষ্ণের সেবা দ্বারা চিত্ত নির্মল হলে সেই শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধনাম উদিত হন, নতুবা নামাপরাধ হবে।

জড়জগতে হরিনামের জন্ম হয় নাই। চিৎকণ স্বরূপে জীব শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থিত হয়ে তার চিন্ময় শরীরে হরিনামের অধিকারী হয়। জগতে মায়াবদ্ধ হয়ে জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধনামের উচ্চারণ করতে পারে না। কিন্তু হ্লাদিনী কৃপায় স্ব-স্বরূপের যে সময়ে ক্রিয়া হয়, তখনই তাঁর নামোদয় হয়। সেই নামোদয় মনোবৃত্তিতে শুদ্ধনাম কৃপা পূর্বক অবতীর্ণ হয়ে ভক্তের ভক্তিপূত জিহ্বায় নৃত্য করেন। নাম অক্ষরাকৃতি নন। কেবল জড়জিহ্বায় নৃত্য করবার সময় বর্ণাকারে প্রকাশিত হন। শ্রীনামের স্বরূপ-সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, শ্রীনাম প্রভুর কৃপা জীবের শুদ্ধস্বত্ত্বে স্ফূর্ত্তি লাভ করে। আমাদের দেহ-মনের শুদ্ধি ও

অশুদ্ধিতার উপর নামের তারতম্য হয়ে থাকে। যতক্ষণ দেহ-শুদ্ধ না হয় অর্থাৎ দেহ-মনের স্মৃতি বিন্দুমাত্র থাকে সেকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধনাম হয় না। অতএব নামগ্রহণকারীর নামগ্রহণের তারতম্যানুসারে শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ হয়ে থাকে। আমরা সেই শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের পরস্পর পার্থক্য গুরুবর্গ যেভাবে কীর্ত্তন করেছেন তা আলোচনা করবো।

শুদ্ধনাম –

* নাম-নামী অভিন্ন। উদিত সূর্য, চিন্তামণি স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ নিত্যমুক্ত। চিৎকণ স্বরূপ জীব শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থিত হয়ে তার চিন্ময় শরীরে শ্রীনাম উচ্চারণে অধিকারী হয়। জড় ইন্দ্রিয়ে নাম উচ্চারণ হয় না। হ্লাদিনী কৃপায় স্ব-স্বরূপে যে সময়ে ক্রিয়া হয়, তখনই নাম উদয় হয়। সেই নাম উদয়ে মনোবৃত্তিতে শুদ্ধনাম কৃপা পূর্বক উদিত হয়ে ভক্তের ভক্তিপূত জিহ্বায় নৃত্য ক...।
* শ্রীনাম প্রপঞ্চাতীত, বৈকুণ্ঠ বস্তু। বৈকুণ্ঠে শ্রীনামের অবস্থান।
* নামাভাসের পরেই শ্রীনামের উদয় হয়।
* শ্রীনামময় তনু শ্রীগুরুপাদপদ্মের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৪ ঘন্টা সঙ্গের ফলে নামের উদয় হয়।
* যার শ্রীনামের ঐকান্তিকী সুখবাঞ্ছা এবং তাঁর প্রতি অহৈতুকী শরণাগতি ব্যতীত নিজের অন্য কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয় তর্পণবাঞ্ছা বা অভিসন্ধি নেই সেরূপ সেবকের অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ জিহ্বায় নামপ্রভু উদিত হন।
* পুরুষাভিমানের গন্ধশূন্য, শ্রীনাম প্রভুর সঙ্গে অপ্রাকৃত সুদৃঢ় সম্বন্ধবান্, স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত সেবকের জিহ্বায় নাম উদিত হন। জীবের শুদ্ধ স্বরূপের সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয়ে শুদ্ধনাম উদিত হন।

তা নামাভাস।

* জীবের শুদ্ধ স্বরূপের সম্বন্ধ জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত নামাভাসের অবধি।

"সম্বন্ধ তত্ত্বের জ্ঞান যাবৎ না হয়।
তাবৎ সে নামাভাস জীবের আশ্রয়।।"

* অসৎ তৃষ্ণা, হৃদয় দৌর্ব্বল্য এবং অপরাধ রূপ মেঘ থাকাকালে অজ্ঞতাবশতঃ সাধক যে নাম করে তা নামাভাস হয়। অথবা সরলতা নিয়ে নাম করলে নামাভাস হয়।

* ত্যাগবাঞ্ছা অথবা মুক্তি বাঞ্ছা থাকলে বা শান্তি কামনা থাকলে নামাভাস হয়।

* ফল্গু বৈরাগী অর্থাৎ ত্যাগীর নামাভাস হয়।

* যেখানে নিষ্কাম অর্থাৎ মুক্তি বাঞ্ছামূলে নাম গ্রহণ সেখানে নামাভাস।

* শ্রীনাম ও নামীতে অভেদ উপলব্ধি থাকলেও সম্বন্ধ জ্ঞান শূন্য থাকায় নামাভাস হয়ে থাকে।

* শুদ্ধনাম না হলে নামাভাস। যেখানে অজ্ঞতাবশতঃ অর্থাৎ ভ্রম, প্রমাদ বশতঃ নামের অশুদ্ধ লক্ষণ হয়, সেখানে কেবল নামাভাস। নামাভাস দু' প্রকার, প্রতিবিম্ব নামাভাস ও ছায়া নামাভাস। ছায়া নামাভাস চার প্রকার, সাঙ্কেত্য নামাভাস, অজামিলের পুত্রকে নারায়ণ নামে ডেকে সাঙ্কেত্য নাম গ্রহণ হয়েছিল। ম্লেচ্ছগণ শুকরকে হারাম বলে ডাকে, তা'তে নামাভাস হয়ে যায়।

পরিহাসরূপ নামাভাস, পণ্ডিতাভিমানী মুমুক্ষুগণ এবং অতত্ত্বজ্ঞ ম্লেচ্ছগণ এবং পরমার্থ বিরোধী অসুরগণ পরিহাস করে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করে মুক্তিলাভ করেছেন। যেমন-জরাসন্ধ ।

স্তোভ, - একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব হরিনাম করছেন, একজন ধূর্ত্ত এসে মুখভঙ্গী করে বলল, তোর হরিকেষ্ট কি করবে? এরূপ পাষণ্ডীরও মুক্তি লাভ হয়।

হেলা, - হেলা অর্থাৎ অনাদর করে অজ্ঞতাবশতঃ অশ্রদ্ধা সহকারে নাম করলেও মুক্তি হয়।

নামাভাসের ফল, –

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থে নামাভাসের ফল এইরূপ কীর্ত্তন করেছেন,–

"নামাভাস দশাতেও অনেক মঙ্গল।
জীবের অবশ্য হয় সুকৃতি প্রবল।।
নামাভাসে নষ্ট হয় আছে পাপ যত।
নামাভাসে মুক্তি হয়, কলি হয় হত।।
নামাভাসে নর হয় সুপংক্তি-পাবন।
নামাভাসে হয় সর্বরোগ নিবারণ।।
সকল আশংকা নামাভাসে দূর হয়।
নামাভাসী সর্বরিষ্ট হৈতে শান্তি পায়।।
যক্ষ-রক্ষ -ভূত-প্রেত গ্রহসমূদয়।
নামাভাসে সকল অনর্থ দূরে যায়।।
নরকে পতিত লোক সুখে মুক্তি পায়।
সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম নামাভাসে যায়।।
নামাভাসে সাক্ষাৎ সে প্রেম দিতে নারে।
নাম হয়ে প্রেম দেয় বিধি অনুসারে।।"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সুবুদ্ধি রায়কে উপদেশ দিয়েছেন,-

"প্রভু কহে, ইঁহা হইতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন।।
এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর 'নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে।

আর কৃষ্ণ নাম লইতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ।।"

মায়াবাদী নামাপরাধী সর্ব বিপদের খনি। এইরূপ অপরাধী মায়াবাদী জনকে নামাভাস তার অভীষ্ট অনুসারে সাযুজ্য নির্বাণ বা মুক্তি দান করে। নাম সর্ব শক্তিমান বলে প্রতিবিম্ব নামাভাসে মায়াবাদীকেও সাযুজ্য মুক্তি ফল দান করে।

নামাভাস থেকে কি করে শুদ্ধনাম করা যায় তা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁর শ্রীহরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থে বলেছেন, –

"নামাভাস ভেদি শুদ্ধনাম লভিবারে ।
সদ্‌গুরু সেবিবে জীব যত্ন সহকারে ।।
ভজনে অনর্থ নাশ যেই ক্ষণে পায়।
চিৎ স্বরূপ নাম নাচে ভক্তের জিহ্বায়।।
নাম সে অমৃতধারা নাহি ছাড়ে আর।
নাম রসে মত্ত জীব নাচে অনিবার।।
নাম নাচে জীব নাচে নাচে প্রেমধন।
জগৎ নাচায় মায়া করে পলায়ন।।"

নামাপরাধঃ-

অপরাধযুক্ত অবস্থায় যে নাম হয় তা নামাপরাধ।

* প্রপঞ্চে নামাপরাধ।
* অনর্থযুক্ত অবস্থায় নামাপরাধ।
* ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বাঞ্ছারূপ কৈতব বা কপটতার সঙ্গে নামাক্ষর উচ্চারণ নামাপরাধ।
* যিনি কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, দম্ভ, অসৎসঙ্গ, জড়াভিনিবেশ দ্বারা হৃদয়ের

দ্বার রুদ্ধ করে ভোগোন্মুখ চিত্তে নাম করেন তার নামাপরাধ হয়।
* অনর্থ, অসৎতৃষ্ণা, হৃদয় দৌর্ব্বল্য, বিষয়ে লোভ ইত্যাদি বজায় রেখে কপটতার সঙ্গে যে নাম গ্রহণ তা নামাপরাধ।
* অন্যাভিলাষী, ভোগী বা অন্যকামকামী হয়ে নাম করলে নামাপরাধ হয়।
* ভোগীর কেবল নামাপরাধ হয়।
* যেখানে শ্রীনামের নিকট হতে শুধুমাত্র সেবা গ্রহণের পিপাসা সেখানে নামাপরাধ।
* যেখানে নাম-নামীতে ভেদ বুদ্ধি সেখানে নামাপরাধ।
* যেখানে মায়াবাদ জনিত ধূর্ত্ততা, মুমুক্ষা ও ভোগবাঞ্ছা হতে অশুদ্ধ নামের উদয় সেখানে নামাপরাধ। ধূর্ত্ততাবশতঃ হলে নামাপরাধ।
যিনি নামের এই দশটি অপরাধ বর্জ্জন না করে নাম গ্রহণ করেন তিনি নামাপরাধী। নামপরায়ণ সাধুর নিন্দা, ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা– এ সকলকে ভগবান্ হতে পৃথক জ্ঞান করা এবং ভগবান্ হতে শিবাদি অন্য কেহ পৃথক ঈশ্বর আছেন এরূপ মনে করা, গুর্ব্ববজ্ঞা, নাম-মহিমা বাচক শাস্ত্রের অবজ্ঞা, নামের মহিমা কেবল স্তব মাত্র এরূপ মনে করা, চিন্তামণি চৈতন্যরসরূপ নামকে জড়সম্বন্ধীয় পুণ্য বা শুভ কর্ম্মের সঙ্গে সমান জ্ঞান করা, অনধিকারী শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা এবং অহংতা মমতারূপ অভিমানের সঙ্গে নাম অনুশীলন করা – এই দশটি নাম অপরাধ।

নামাপরাধী নামের নিকট যে ফল আকাঙ্ক্ষা করে নাম করে, নাম তাকে সেরূপ ফল দান করে। নাম অপরাধের ফল-- ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা অনর্থ ও কামে অতৃপ্তি। নামাপরাধী শঠতা কপটতার সঙ্গে নাম করলে নাম তাকে ঐ সকল কাম্য বস্তু দান করে। নামাপরাধী যদি সরলতা সহকারে নাম করে তবে নামাভাস রূপ সুকৃতি দান করে এই সুকৃতি প্রবল হয়ে শুদ্ধনাম পরায়ণ সাধুর সঙ্গ হয়।

নাম সাধন

অনর্থগ্রস্থ সাধক প্রতিদিন নির্জনে কিয়ৎকাল বিষয়োৎপাত ত্যাগ পূর্বক ভাবের সঙ্গে নাম করবে। ক্রমে ক্রমে ঐ কার্যের সময়ের পরিমাণকে বৃদ্ধি করবে। অবশেষে সকল সময়েই এক অদ্ভুত ভাব উদিত হবে। তখন উৎপাত নিকটে আসতে ভয় করবে। প্রথমে সাধকগণ সংখ্যা নাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করবেন। কীর্ত্তন স্মরণকালে নামার্থ দ্বারা অপ্রাকৃত স্বরূপের নিরন্তর অনুশীলন করবেন। নামানুশীলন দ্বারা অতিশীঘ্র সকল অনর্থ দূর হয়ে যায় এবং চিত্ত নির্মল হয়। প্রাথমিক অবস্থায় অবিদ্যা পিত্তোপতপ্ত রসনায় নামে রুচি থাকে না। নিরন্তর নাম কীর্ত্তন ফলে নামে নৈরন্তর্য্য এলে নামে একটু আদর আসে। এ অবস্থায় নাম উচ্চারণ রহিত হয়ে থাকতে ভাল লাগে না। আদরের সঙ্গে নিরন্তর নাম করতে করতে নামে পরম আস্বাদ জন্মে। তখন পাপ, পাপবীজ, যে পাপ বাসনা ও ঐ সকলের মূল যে অবিদ্যাভিনিবেশ তা দূর হয়। সর্বতোভাবে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করে নিরন্তর সাধুসঙ্গে নিরপরাধে নির্বন্ধিনী মতির সঙ্গে নাম কীর্ত্তন করলে স্বল্প কালের মধ্যেই অবিদ্যা বিনাশ হয়ে চিত্ত শুদ্ধ হয়। যত অবিদ্যা নষ্ট হয় ততই যুক্ত বৈরাগ্য ও সম্বন্ধ জ্ঞান উদয় হয়ে চিত্তকে অতি নির্মল করে। নাম গ্রহণের সময় নামের স্বরূপ অর্থ আদরে অনুশীলন পূর্বক কৃষ্ণের নিকট সক্রন্দন প্রার্থনা করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় শুদ্ধ চিত্তে অপ্রাকৃত নাম উদিত হন।

অন্তর্মুখ সাধকই নাম গ্রহণের অধিকারী। নাম-নামীতে অভেদ বুদ্ধি ব্যতীত অন্তর্মুখ হতে পারে না। অন্তর্মুখ সাধক প্রথমে দশ অপরাধ ত্যাগ পূর্বক কেবল নাম স্মরণ ও কীর্ত্তনের নৈরন্তর্য্য, সাধন করবেন।

স্পষ্ট স্পষ্ট নাম উচ্চারণ পূর্বক কীর্ত্তন ও স্মরণ করবেন। নাম স্পষ্ট, স্থির ও সুখকর হলে শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপ ধ্যান করবেন। হাতে নাম সংখ্যা, মনে বা মুখে কৃষ্ণনাম অনুসন্ধান করতে করতে নামার্থ যেরূপ তা' চিন্ময় নয়নে দর্শন করবেন। অথবা শ্রীবিগ্রহের সামনে বসে রূপ দর্শন ও নাম স্মরণ করবেন। নামের সঙ্গে রূপ একত্ব হলে কৃষ্ণগুণ সকল স্মরণে আনতে অভ্যাস করবেন। নাম, রূপ ও গুণ একত্র অভ্যস্ত হলে প্রথমে মন্ত্রধ্যানময়ী লীলার স্মরণ করে তার নাম, রূপ, গুণের সঙ্গে ঐক্য করে নাম করবেন। ঐ সময়ে নাম রসের উদয় হয়। মন্ত্র ধ্যানময়ী ভাবনা দৃঢ়া হলে স্বারসিকী অষ্টকাল লীলা ধ্যান করতে করতে সম্পূর্ণ রসোদয় হয়। নাম সাধনের আরম্ভকালে নাম সাধনের সকল প্রকার প্রতিবন্ধক দূর করে একাদশভাবে ব্রতী হয়ে নাম সাধনের পঞ্চবিধ দশা অতিক্রম করেন। শ্রবণ, বরণ, স্মরণ, আপন ও সম্পত্তি দশায় সাধক স্বরূপ সিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি লাভ করে ধন্যাতিধন্য হন। শ্রীকৃষ্ণ কৃপা ক্রমে সম্পত্তি দশায় বস্তুসিদ্ধিতে সিদ্ধদেহে ব্রজলীলার পরিকরত্ব প্রাপ্ত হন। এটাই নাম ভজনের চরম ফল।

সাধক প্রথম অবস্থায় অপরাধ যাতে আর না হয় সে দিকে সুতীব্র দৃষ্টি রেখে নাম সাধনে যাতে অযত্ন না হয় তার জন্য বারংবার সতর্কতা অবলম্বন পূর্বক নাম গ্রহণ করবেন। নাম সংখ্যা অধিক হবে, এ চেষ্টা অপেক্ষা নিরন্তর স্পষ্টাক্ষরে ভাবযুক্ত মনে নাম গ্রহণের যত্ন করা উচিত।

“ একাগ্র মানসে নির্জনেতে স্বল্পক্ষণ।
নামস্মৃতি অভ্যাস করিবে ভক্তজন।।
অতএব স্পষ্ট নাম ভাব লগ্ন মনে।
সদা হয় এ প্রার্থনা তোমার চরণে।।
আপন যত্নেতে কেহ কিছু নাহি পারে।

তোমার প্রসাদ বিনা এ ভব সংসারে।।
যত্ন করি কৃপা মাগি ব্যাকুল অন্তরে।
তুমি কৃপাময় কৃপা কর অতঃপরে।।
তব কৃপা লাভে যদি না করি যতন।
তবে আমি ভাগ্যহীন হে শচীনন্দন।।"

শ্রীনাম গ্রহণে নিষ্কপট যত্ন আগ্রহ আবশ্যক। নিষ্কপট যত্ন আগ্রহের সঙ্গে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীনাম প্রভুর নিকট ব্যাকুল অন্তরে কৃপা প্রার্থনা করতে হবে। কৃপাই সর্ব কার্যের মূল। কৃপা ব্যতীত নামাপরাধ বর্জ্জন করে শুদ্ধনাম গ্রহণ করা যায় না।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলেছেন–

"যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন, স্বরূপ-রামরায়।।"
" তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।"

শ্রীচৈতন্যদেবের এই বাণীকে একমাত্র সার করে যারা বিপ্রলম্ভময়ী সুনীচতা ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক অনুক্ষণ গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে স্বরাট্ শ্রীনাম প্রভুর দ্বারে দ্বারী হয়ে থাকেন তাদেরই নাম ভজন হয়। শ্রীনাম প্রভুর কৃপার জন্য সোৎকণ্ঠা প্রতীক্ষাই ভজন।

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।।
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয়।।
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ।।
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান।।

এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তাঁর প্রেম উপজয়।।
(শ্রীচৈ: চ: অ: ২০/২০-২৬)

সাধ্যবস্তু শ্রীনাম প্রেম লাভের জন্য সর্ব অপরাধের মূল দেহাত্মবোধ সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করে সম্বন্ধের সঙ্গে নৈরন্তর্যময়ী নাম সাধন করতে হবে। যারা এই শ্লোককে গলায় কণ্ঠহার করে নিরন্তর নামানুশীলন করে তারা অতি অল্প কালের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সেবা লাভ করেন।

"ঊর্দ্ধ্ব বাহু করি কহো, শুন সর্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি পরো কণ্ঠে এই শ্লোক।।
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ।।"
(শ্রীচৈ: চ: আ:-১৭/৩২-৩৩)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

FEBRUARY TUESDAY 2000 ১৫।২।২০০০

২২ মাঘ বাং, মঙ্গলবার, সন ১৪০৬

১৭ই মাঘ ১৪০৬, মঙ্গলবার, একাদশী

আমরা সকলেই নিরন্তর শ্রীপঞ্চতত্ত্বনাম উচ্চারণ করবার যত্ন করবো। প্রতি মুহূর্ত শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব নাম উচ্চারণ ও স্মরণ যেন আমাদের ভুল না হয়।

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥"
শ্রীচৈ.চ.

সেই সঙ্গে একাগ্রমনসে অপরাধশূন্য হয়ে নির্জনে সুশীল শ্রীহরিনাম অন্তর্মুখ মনে অর্থাৎ ধ্যান করে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কীর্তন করবার যত্ন-চেষ্টা ও অধ্যবসায় করতে হবে।

(শ্রীশ্রীল গুরুঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত উপদেশের কিয়দংশ)